নবী-রাসুল সিরিজ-২
কাসাসুল কুরআন-২
হযরত ইবরাহিম আ.
হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম
হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম
হযরত লুত আলাইহিস সালাম
হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম
মূল
মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.

হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম

নবী-রাসুল সিরিজ-২

কাসাসুল কুরআন-২

হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম
হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম
হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম
হযরত লুত আলাইহিস সালাম
হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম

মূল
মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.

অনুবাদ
মাওলানা আবদুস সাত্তার আইনী

কাসাসুল কুরআন-২
মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবি রহ.

অনুবাদ
মাওলানা আবদুস সাত্তার আইনী

সম্পাদনা
মাকতাবাতুল ইসলাম সম্পাদনা বিভাগ

প্রকাশক
হাফেজ কুতুবুদ্দীন আহমাদ

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ২০১৫ খ্রি.

প্রচ্ছদ ॥ তকি হাসান

সার্বিক যোগাযোগ
মাকতাবাতুল ইসলাম
[সেরা মুদ্রণ ও প্রকাশনার অগ্রপথিক]

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
৬৬২ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা
ঢাকা-১২১২
০১৯১১৬২০৪৪৭
০১৯১১৪২৫৬১৫

বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯১২৩৯৫৩৫১
০১৯১১৪২৫৮৮৬

মূল্য : ১৭০ [একশত সত্তর] টাকা মাত্র

QASASUL QURAN [2]
Writer : Mawlana Hifjur Rahman RH
Translated by : Abdus Sattar Aini
Published by : Maktabatul Islam
Price : Tk. 170.00
ISBN : 978-984-90976-6-2
www.facebook/Maktabatul Islam
www.maktabatulislam.net

সূচি

হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম

হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম

হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম

হযরত লুত আলাইহিস সালাম

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম

বংশপরিচয়

তাওরাতে হযরত ইবরাহিম আ.-এর বংশপরিচয় নিম্নরূপ :
ইবরাহিম খলিলুল্লাহ বিন তারিহ বিন নাহুর বিন সারুজ বিন বিন রা'উ বিন ফালিখ বিন আবির বিন শালিহ বিন আরফাকশায বিন সাম বিন নুহ আ.। এই বিবরণটি তাওরাত ও ইতিহাসের অনুরূপ। কিন্তু কুরআন মাজিদে তাঁর পিতার নাম আযার বলা হয়েছে।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

(سورة الأنعام)

'স্মরণ করো, (সেই সময়ের কথা, যখন) ইবরাহিম তার পিতা আযারকে বলেছিলো, "আপনি কি মূর্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেন? আমি আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।" [সুরা আন'আম : আয়াত ৭৪]

আযার শব্দের বিশ্লেষণ

যেহেতু ইতিহাস ও তাওরাত হযরত ইবরাহিম আ.-এর পিতার নাম তারিহ বলছে, আর কুরআন মাজিদ বলছে আযার, তাই মুফাস্সির আলেমগণ এ-বিষয়টির তথ্য বিশ্লেষণে দুই প্রকারের মত অবলম্বন করেছেন :

১। এমন একটি অবস্থা বের করা হোক, যাতে উভয় নামের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটে এবং অনৈক্য দূর হয়ে যায়।

২। তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তমূলক কথা বলে দেয়া হোক যে, এই দুটি নামের মধ্যে কোনটি সঠিক নাম এবং কোনটি ভুল; অথবা দুটি নামই সঠিক, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন লোকের নাম।

প্রথম মতের আলেমগণের সিদ্ধান্ত এই, দুটি নামই এক ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; 'তারিহ' ব্যক্তিবাচক নাম আর 'আযার' গুণবাচক নাম।
তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, প্রতিমা-প্রেমিককে আযার বলা হয়। তারিহের মধ্যে যেহেতু প্রতিমা-নির্মাণ ও প্রতিমা-পূজা উভয় বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান ছিলো, এ-কারণে সে আযার উপাধিতে প্রসিদ্ধ হয়ে পড়েছে।

আবার তাঁদের কেউ কেউ ধারণা করেন, আযার শব্দের অর্থ أعوج অর্থাৎ স্বল্পবুদ্ধি বা নির্বোধ ও অতিশয় দুর্বল বৃদ্ধ।[১] তারিখের মধ্যে এই বিষয়গুলো বিদ্যমান ছিলো। তাই তাকে এই বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। কুরআন মাজিদ তার এই গুণবাচক প্রসিদ্ধ নামটিকে বর্ণনা করেছে। আল্লামা আবুল কাসেম আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ আস-সুহাইলি (মৃত্যু : ৫৮১ হিজরি) তাঁর الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام গ্রন্থে এ-মতটিই গ্রহণ করেছেন।

আর দ্বিতীয় মতের আলেমগণের বিশ্লেষণ হলো, আযার একটি প্রতিমার নাম। তারিহ সেই প্রতিমার পূজারী ও মোহন্ত ছিলো। যেমন মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে কুরআন মাজিদের উপরিউক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হলো—

أَتَتَّخِذُ آزَرَ إِلَهًا آزَرَ   اي   أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً (سورة الأنعام)

'তুমি কি আযারকে উপাস্য বলে মান্য করো।' অর্থাৎ প্রতিমাগুলোকে খোদা বলে মানো?

হাসান বিন মুহাম্মদ আস-সাগানি একই মত পোষণ করেছেন। কেবল ব্যাকরণের দিক থেকে তিনি উহ্য বাক্য সম্পর্কে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছেন। মোটকথা, তাঁদের উভয়ের কাছে آزر শব্দটি أبيه শব্দের بدل বা Noun of apposition নয়; বরং এটি মূর্তির নাম। তাঁদের বর্ণনা অনুযায়ী কুরআন মাজিদে ইবরাহিম আ.-এর পিতার নাম উল্লেখ নেই।

এটাও একটা প্রসিদ্ধ বক্তব্য যে, হযরত ইবরাহি আ.-এর পিতার নাম ছিলো তারিহ (বা তারিখ) এবং তাঁর চাচার নাম ছিলো আযার। যেহেতু আযারই তাঁকে নিজের সন্তানের মতো প্রতিপালন করেছিলো, এইজন্য কুরআন মাজিদ আযাকে তাঁর পিতা বলে সম্বোধন করেছে। যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, عم الرجل صنو أبيه 'কারো চাচা তার পিতার মতোই।'

আল্লামা আবদুল ওয়াহাব বুখারি বলেন, এসব অভিমতের মধ্যে মুজাহিদ রহ.-এর অভিমতটিই যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য। কারণ মিসরবাসীদের একটি প্রাচীন দেবতার নাম পাওয়া যায় আযওয়ারিস (ازوريس)। এর

---

[১] দেখুন : তাজুল উরূস মিন জাওয়াহিরি কামুস, মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আবদুর রাজ্জাক আয-যুবাইদি। তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২।

অর্থ 'শক্তিমান ও সাহায্যকারী খোদা'। মূর্তিপূজক সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে শুরু থেকেই এই প্রথা প্রচলিত ছিলো যে তারা প্রাচীন দেবতাগুলোর নামেই নতুন দেবতাগুলোর নামকরণ করতো। এ-কারণে এই মূর্তিটির নামও প্রাচীন মিসরীয় দেবতার নামানুসারে 'আযার' রাখা হয়েছে। তবে হযরত ইবরাহি আ.-এর পিতার মান তারিহই ছিলো।

আমাদের মতে এসব বক্তব্য কেবল অযথা জটিলতা সৃষ্টি করছে। কেননা, কুরআনুর কারিম যখন পরিষ্কারভাবে আযারকে হযরত ইবরাহিম আ.-এর পিতাই বলেছে, তখন বংশতত্ত্ববিশেষজ্ঞদের এবং বাইবেলের ধারণাপ্রসূত অনুমানে প্রভাবিত হয়ে কুরআন মাজিদে নিশ্চিত বিবৃতিকে রূপক অর্থে নেয়া অথবা তার চেয়ে আরো আগে বেড়ে গিয়ে কুরআনে খামাখা ব্যাকরণশাস্ত্রের উহ্য শব্দ মেনে নেয়ার জন্য কোন্ শরিয়তসম্মত প্রকৃত প্রয়োজন বাধ্য করছে?

যদি মেনে নেয়া হয় যে, প্রতিমার প্রেমিককে আযার বলা হয় অথবা তা কোনো মূর্তির নাম, তারপরও কোনো উহ্য শব্দ না ধরে এবং বিরূপ ব্যাখ্যা না দিয়ে এটা কেনো হতে পারে না যে উল্লিখিত দুটি কারণেই আযারের নাম আযার রাখা হয়েছে। কারণ মূর্তিপূজক সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই এই প্রথা চালু হয়ে আসছে যে তারা কখনো কখনো 'দেবতার দাস' অর্থ প্রকাশ করে নিজেদের সন্তানের নাম রাখতো। আবার কোনো কোনো সময় দেবতার নামেই সন্তানদের নাম রেখে দিতো।

আসল কথা হলো, কালদি ভাষায় শ্রেষ্ঠ পূজারীকে ادار 'আদার' বলা হয়; আরবি ভাষায় একেই آزر 'আযার' বলা হয়েছে। তারিহ (বা তারিখ) যেহেতু প্রতিমা-নির্মাতা ও শ্রেষ্ঠ মূর্তিপূজক ছিলো, তাই 'আযার' নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এটি ব্যক্তিগত নাম ছিলো না; বরং গুণবাচক উপাধি ছিলো। উপাধি যখন নামের স্থান দখল করে ফেলেছে, কাজেই কুরআন মাজিদও তাকে এই নামেই সম্বোধন করেছে।

তা ছাড়া সেই মহাপবিত্র মানব হযরত ইবরাহিম আ.-এর চারিত্রিক মর্যাদা এত উন্নত যে, মূর্তিপূজার নিন্দা প্রসঙ্গে যখন আযারের সঙ্গে তার বিতর্ক হয়ে গেলো এবং আযার বিরক্ত হয়ে বললো—

أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (سورة مريم)

"হে ইবরাহিম, তুমি কি আমার দেব-দেবী থেকে বিমুখ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করবোই। (প্রস্তর নিক্ষেপ করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবো।) তুমি চিরদিনের জন্য আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।" [সুরা মারইয়াম : আয়াত ৪৬]

এমন কঠোর ও মনোযন্ত্রণাদায়ক কথোপকথনের সময়ও হযরত ইবরাহিম আ. পিতৃ-সম্পর্কের মর্যাদা শুধু এতটুকু বলেছিলেন—

سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (سورة مريم)

"তোমার প্রতি সালাম।[২] আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো, নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। [সুরা মারইয়াম : আয়াত ৪৭]

এমন মহান ব্যক্তিত্ব থেকে এটা কেমন করে আশা করা যায় যে, তিনি নিজের পিতা আযারকে নির্বোধ দুর্বল বৃদ্ধ এবং এ-জাতীয় তুচ্ছতাব্যাঞ্জক শব্দ দিয়ে সম্বোধন করবেন।

অতএব, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ইতিহাসের 'তারিখ' আযারই বটে এবং এটা তার ব্যক্তিগত নাম, গুণবাচক নাম নয়। তারিখ হয়তো ভুল না অথবা আযার শব্দের অনুবাদ, যা তাওরাতের অন্যান্য নামের মতো শেষ পর্যন্ত আর অনুবাদ থাকে নি; বরং আসল নামে পরিণত হয়েছে।

মারাতাশি সপ্তদশ শতাব্দীর একজন খ্রিস্টান শিক্ষাবিদ। তিনি কুরআন মাজিদের অনুবাদ করেছেন এবং কুআনুল কারিমের প্রতি খুবই সূক্ষ্ম ও পক্ষপাতমূলক আক্রমণ করেছেন। তিনি এ-ক্ষেত্রে তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী একটি অনর্থক ও দুর্বল প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। তার সারমর্ম এই— ইফযবিউসের গির্জার ইতিহাসের একটি বাক্যে এই শব্দটি বর্ণিত হয়েছে। যাকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভুল সিগা ও শব্দরূপের সঙ্গে কুরআন মাজিদে যোগ করেছেন।

কিন্তু বিচিত্র তামাশার কথা হলো, মারাতাশি নিজের এই দাবি প্রমাণে ইতিহাসের সেই বাক্যটুকুও উল্লেখ করেন নি, যা থেকে এই শব্দটি গৃহীত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি সেই মূল শুদ্ধ শব্দটিরও সন্ধান দেন নি যা থেকে এই ভুল শব্দটি বানিয়ে নেয়া হয়েছে। তা ছাড়া তিনি এটাও বলেন নি যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওই শব্দটি

---

[২] এখানে -এর অর্থ অভিভাবদন নয়, বিদায় গ্রহণ।—কাশশাফ, জালালাইন, কুরতুবি ইত্যাদি।

বর্ণনা করার কী প্রয়োজন পড়েছিলো। সুতরাং মারাতাশির ওই উক্তিটি সম্পূর্ণ প্রমাণহীন অনর্থক কথা কেবল পক্ষপাতিত্ব ও মূর্খতার ভিত্তিতে বলা হয়েছে। বস্তুত সত্য তা-ই, যা আমি এইমাত্র উপরে বর্ণনা করেছি।

হযরত নুহ আ. পর্যন্ত হযরত ইবরাহিম আ.-এর বংশধারা

তাওরাত ও ইতিহাস হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম থেকে হযরত নুহ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত যেসব ধাপ বিবৃত করেছে তা নিচে দেয়া হলো। এই নসবনামা বা বংশপরম্পরার শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতার বিষয়টি আনুমানিক ও ধারণাপ্রসূত মতের অধিক কিছু নয়। কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বংশ সম্পর্কে এ-কথা তো সুনিশ্চিত যে তিনি হযরত ইবরাহিম আ.-এর বংশধর, তারপরও আদনান থেকে ওপরের ধাপগুলো স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সিদ্ধান্ত এই—كذب النسابون 'বংশতত্ত্ব বিশেষজ্ঞগণ নামগুলোর নির্দিষ্টতার ব্যাপারে ভুল বর্ণনা করেছেন।' সুতরাং হযরত ইবরাহিম আ. থেকে হযরত নুহ আ. পর্যন্ত বংশধারা ভুল ও মিথ্যা বর্ণনা থেকে কীভাবে বিশুদ্ধ থাকতে পারে?

নাম	পিতার নাম	পুত্রের জন্মকালে পিতার বয়স
সাম	নুহ আ.	৫০০ বছর
আরফাকশায	সাম	১০০ বছর
শালিহ	আরফাকশায	৩৫ বছর
আবির	শালিহ	৩০ বছর
ফালিখ	আবির	৩৪ বছর
রা'উ	ফালিখ	৩০ বছর
সারুজ	রা'উ	৩২ বছর
নাহুর	সারুজ	৩০ বছর
তারিহ	নাহুর	২৯ বছর
ইবরাহিম আ.	আযার (তারিহ বা তারিখ)	৭০ বছর[৩]

---

[৩] الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام গ্রন্থে বর্ণিত বংশ পরম্পরা :

إبراهيم- خليل الرحمن - بن تارح وهو آزر بن ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالخ بن عيبر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح

এই গণনা অনুসারে হযরত ইবরাহি আ.-এর জন্মকাল থেকে হযরত নুহ আ. পর্যন্ত আটশো নব্বই বছর হয়। হযরত নুহ আ.-এর পূর্ণ বয়স বা আয়ুষ্কাল ৯৫০ বছর বলা হয়। তখন এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, হযরত নুহ আ.-এর আয়ুষ্কার ৬০ বছর বাকি থাকতে তাঁর জীবদ্দশাতেই হযরত ইবরাহিম আ.-এর জন্ম হয় এবং তাঁরা উভয়ে এই ৬০ বছর সমসাময়িক জীবনযাপন করেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে এটা ভিত্তিহীন কথা এবং নিশ্চিতভাবে ভুল ও অর্থহীন। কাজেই এ-কথা মানতে হবে যে, তাওরাতের এই গণনা ও হিসাব নিরেট বানোয়াট কল্পকাহিনির চেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী নয়। আর বাস্তবিক ব্যাপারও এটাই যে, প্রাচীনকালে ইহুদিদের কাছে ইতিহাসের অধ্যায়সমূহ এ-জাতীয় কল্পকাহিনি ও রেওয়ায়েতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এগুলোর ঐতিহাসিক সত্যতা, সময়ের বৈপরীত্য এবং মতানৈক্যের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ রাখা হয় নি।

ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদদের অর্থহীন বক্তব্য

ইউরোপের প্রাচ্যবিদদের একটি দল ইসলামের শত্রুতায় বিশেষ পাণ্ডিত্য রাখেন। বিদ্বেষ ও শত্রুতার প্রজ্জ্বলিত আগুনে তাঁরা বস্তবতা ও সত্য ঘটনাবলিকে অস্বীকার করতে প্রয়াস পান। এ-জাতীয় ক্ষেত্রের মধ্যে—যেখানে কুরআন মাজিদের বিরুদ্ধে কোনো দলিল-প্রমাণ ছাড়াই তাঁদের সমালোচনার তরবারি চলতে থাকে—হযরত ইবরাহিম আ.-এর ব্যক্তিত্বও একটি ক্ষেত্র। রচিত দায়িরাতুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়া

ইবরাহিম আ.-এর আরো দুটি বংশপরম্পরা বর্ণিত আছে :

২. هو إبراهيم عليه السلام بن تارخ (وهو ءازر) بن ناخور بن ساروغ بن ارغو بن فالَع بن غابر بن شالخ بن قينان بن ارفخشذ بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام

৩. هو إبراهيم عليه السلام بن تارح بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن أفكشاذ بن سام بن نوح عليه السلام

অর্থাৎ নামের বানান ও উচ্চারণের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। যেমন : তারিহ (تارح) ও তারিখ (تارخ); সারুজ (سروج) ও সারুগ (ساروغ); ফালিখ (فالخ), ফালা' (فالَع) ও ফালিজ (فالج); আবির (عابر), গাবির (غابر) ও ইবার (عيبر); শালিহ ও শালিখ; আরফাকশায (أفكشاذ) ও আরফাখশায (ارفخشذ)।

দ্বিতীয় সূত্রে শালিখের পর কীনানের নাম বলা হয়েছে।

(دائرة المعارف الإسلامية / Encyclopedia of Islam) উইনসিঙ্কের (Arent Jan Wensinck) বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছে যে, সর্বপ্রথম স্পিঙ্গার (Sprenger) এই দাবি করেছেন, কুরআন মাজিদে একটি দীর্ঘ সময়সীমা পর্যন্ত হযরত ইবরাহিম আ.-এর ব্যক্তিত্ব পবিত্র কাবাগৃহের পুনর্নির্মাতা এবং দীনে হানিফের প্রথপ্রদর্শকরূপে আলোচিত হয় নি। অবশ্য দীর্ঘকাল পরে তাঁর ব্যক্তিত্বকে ওইসব গুণে গুণান্বিত বলে প্রকাশ করা হয়েছে এবং তাতে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশেষ গুরুত্ব দৃষ্টিগোচর হয়। যেহেতু এই দাবি তাঁর সংক্ষিপ্ত বিবৃতির প্রেক্ষিতে তখনো অসম্পূর্ণ ছিলো, তাই দীর্ঘকাল পর স্পিঙ্গারের এই বক্তব্যকে স্নোগ এবং হিক্রোনিয়াহ বেশ বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করেছেন এবং নিজেদের কল্পনাপ্রসূত দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে তাকে বিশেষ রঙে রঞ্জিত করেছেন। তিনি বলেছেন :

"পবিত্র কুরআনে যতগুলো মক্কি (মক্কায় নাযিল-হওয়া) আয়াত এবং সুরা রয়েছে, তার কোনো এক জায়গাও হযরত ইসমাইল আ.-এর সঙ্গে হযরত ইবরাহিম আ.-এর সম্পর্ক দেখা যায় না এবং তাঁকে 'সর্বপ্রথম মুসলমান'ও মুসলমানও বলা হয় না। বরং তিনি কেবল একজন নবী ও পয়গম্বর হিসেবে গোচরীভূত হন। তাঁর আলোচনাযুক্ত একটি আয়াতও এমন পাওয়া যাবে না, যা তাঁকে কা'বাগৃহের প্রতিষ্ঠাতা, হযরত ইসমাইল আ.-এর পিতা, আরবের নবী ও পথপ্রদর্শক, মিল্লাতে হানিফির আহ্বানকারী বলে প্রকাশ করেছে। সুরা আয-যারিয়াত, সুরা সুরা আল-হিজর, সুরা আস-সাফফাত, সুরা আল-আন'আম, সুরা হুদ, সুরা মারইয়াম, সুরা আল-আম্বিয়া, যার সবগুলোই মক্কি সুরা, আমাদের দাবির পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করছে। এ থেকে এই স্পষ্ট ফল প্রকাশিত হয় যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পূর্বে আরব ভূখণ্ডে কোনো নবী আসেন নি এবং ইনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি নবুওতের দাবি করেছেন।

অবশ্য যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মদিনার জীবন শুরু হয় তখন মদিনায় নাযিল-হওয়া সুরাগুলোতে হযরত ইবরাহিম আ. সম্পর্কে আলোচনার সময় তাঁর এ-সকল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা হয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বসহ সেগুলোর প্রতি আলোকপাত করা হয়।

কেনো এমন হলো? কেনো এই ভিন্নতা বিদ্যমান? এর কারণ হলো এই, মক্কার জীবনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার জীবনে

যাবতীয় বিষয়ে ইহুদিদের ওপর নির্ভর করতেন, তাদের নীতি-পন্থাই পছন্দ করতেন, তাই তখন পর্যন্ত তিনি হযরত ইবরাহিম আ.-এর ব্যক্তিত্বকে সে-দৃষ্টিতেই দেখতেন, যে-দৃষ্টিতে ইহুদিরা তাঁকে দেখতো। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় পৌঁছে ইহুদিদেরকে তাঁর ইসলামি মিশনের দাওয়াত জানালেন, তখন তারা ইসলামের দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকৃতি জানালো, এমনকি তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন চিন্তা করলেন এবং গভীরভাবে ভাবলেন। অবশেষে তাঁর তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও বিচক্ষণতা তাঁকে পথের সন্ধান দিলো এবং তিনি আরবদের জন্য ইহুদিদের ইহুদি ধর্ম থেকে ভিন্ন এমন এক ধর্মের প্রতিষ্ঠা করলেন যাকে ইবরাহিমি ইহুদি ধর্ম বলা উচিত। সুতরাং, এর পূর্ণতা সাধনের জন্য কুরআন মাজিদের মাদানি সুরাগুলোতে হযরত ইবরাহিম আ.-এর ব্যক্তিত্বকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে তিনি মিল্লাতে হানিফির আহ্বানকারী, আরবদের নবী হযরত ইসমাইলের পিতা এবং কাবাগৃহের প্রতিষ্ঠাতারূপে গোচরীভূত হচ্ছেন।"

এটাই সেই দাবি ও তার প্রমাণ যা স্প্রিঙ্গার, স্নোগ, উইনসিঙ্ক-এর মতো ইসলামের শত্রু ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদদের পক্ষ থেকে নির্ভেজাল মিথ্যাচার। এই মিথ্যা রচনা কেবল এ-জন্য করা হয়েছে, যাতে এ-জাতীয় দুর্বল ভিত্তির ওপর খ্রিস্টান ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইসলাম ধর্মের হীনতার প্রসাদ নির্মাণ করা যেতে পারে। তা ছাড়া এ-জন্যও, যাতে হযরত ইবরাহিম আ. সম্পর্কে এ-কথা প্রমাণ করা যায় যে আরবদের সঙ্গে তাঁর বংশগত সম্পর্কও নেই, এমনকি ধর্মীয় সম্পর্কও নেই। কিন্তু যখন একজন ইতিহাসবিদ এবং একজন সমালোচক ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদদের এই দাবি এবং দাবির পক্ষে প্রমাণসমূহকে কেবল ঐতিহাসিক ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন, তখন এটা পরিষ্কাররূপে প্রতিভাত হয় যে, এই যা-কিছু বলা হলো, প্রকৃত সত্য ও বাস্তব ঘটনাবলি থেকে ইচ্ছাকৃত চোখ বন্ধ করে কেবল শত্রুতা এবং হিংসা ও বিদ্বেষবশত বিনা প্রমাণেই বলা হলো। ফলে তাদের দাবির পক্ষে সবশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হিসেবে এটাই পেশ করা হয়েছে যে, মক্কায় নাযিল-হওয়া সুরাসমূহে হযরত ইবরাহিম আ.-সম্পর্কিত ওইসব গুণাবলি গোচরীভূত হয় না, যা মদিনায় নাযিল হওয়া সুরাগুলোতে পাওয়া যায়। কিন্তু আফসোসের সঙ্গে বলতে হয়, এটি আপাদমস্তক মিথ্যা; বরং এটি

জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইচ্ছাপূর্বক ও সংকল্পবদ্ধ বিশ্বাসঘাতকতা। কারণ, মক্কি সুরাগুলো থেকে কেবল ওইসব আয়াতেরই উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, যাতে হযরত ইবরাহিম আ.-কে কেবল একজন নবীরূপেই উপস্থাপিত করা হয়েছে। কিন্তু যে-মক্কি সুরাকে হযরত ইবরাহিম আ.-এর ব্যক্তিত্বকে সবদিক থেকে উজ্জ্বল করে তোলার জন্য তাঁর নামে শিরোনাম দিয়ে নাযিল করা হয়েছে, অর্থাৎ সুরা ইবরাহিম, সেই সুরা থেকেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে। যেসব মানুষ কুরআন মাজিদ থেকে সরাসরি কোনো অর্থ উদ্ধার করতে পারে না এবং উপকৃত হতে পারে না, যাতে তাদের সামনে মূর্খতার পর্দা পড়েই থাকে এবং ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদদের অন্ধ অনুকরণে তারা তাঁদের ভুল দাবিকে সঠিক বলে মনে করে।

সুরা ইবরাহিম মক্কি সুরা; এর আয়াতগুলো হিজরতের পূর্বেই নাযিল হয়েছে। সুরা ইবরাহিম নিম্নলিখিত সত্যগুলো ঘোষণা করছে।

এক.

হযরত ইবরাহিম আ. আরবে অর্থাৎ হিজাযে অবস্থান করেন এবং আল্লাহর রাসুল হিসেবে নিজেকে ও নিজের বংশধরকে প্রতিমাপূজা থেকে বেঁচে থাকার এবং সেই স্থানটিকে গোটা বিশ্বের নিরাপত্তার কেন্দ্র করে দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রার্থনা করেন।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (سورة إبراهيم)

'স্মরণ করো, ইবরাহিম বলেছিলো, "হে আমার প্রতিপালক, এই নগরীকে (মক্কা মুকাররমাকে) নিরাপদ করো এবং আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে প্রতিমাপূজা থেকে দূরে রেখো।" [সুরা ইবরাহিম : আয়াত ৩৫]

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"হে আমার প্রতিপালক, এ-সকল প্রতিমা[১] তো বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে-ই আমার দলভুক্ত; কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সুরা ইবরাহিম : আয়াত ৩৬]

---

[১] এখানে هُنَّ সর্বনাম দ্বারা প্রতিমাগুলোকে বুঝাচ্ছে।

দুই.

হযরত ইবরাহিম আ. স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে, হিজায অঞ্চলটি (যা গোটা আরব দেশের হৃৎপিণ্ডস্বরূপ) তাঁরই বংশধরদের মাধ্যমে আবাদ হয়েছে এবং তারাই এতে বসতি স্থাপন করেছে এবং তারাই প্রস্তরময় প্রান্তরে বাইতুল হারাম অর্থাৎ কা'বাগৃহ নির্মাণ করেছে। যেমন কুরআন মাজিদে উল্লেখ করা হয়েছে—

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ () رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (سورة إبراهيم)

"হে আমার প্রতিপালক, আমি আমার বংশধরদের কতিপয়কে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের কাছে, হে আমার প্রতিপালক, এইজন্য যে, তারা যেনো সালাত কায়েম করে। অতএব তুমি কিছু মানুষের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলাদি দিয়ে তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করো, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। হে আমার প্রতিপালক, তুমি তো জানো যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি; আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না।" [সুরা ইবরাহিম : আয়াত ৩৭-৩৮]

তিন.

হযরত ইবরাহিম আ. হযরত ইসমাইল ও হযরত ইসহাক আ.-এর পিতা। এই ইসমাইল আ.-ই আরববাসীদের আদি পিতা। আর হযরত ইবরাহিম আ. মিল্লাহে হানিফির প্রতীক নামায কায়েম করার জন্য দোয়া করছেন—

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ () رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ () رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (سورة إبراهيم)

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাকে আমার বার্ধ্যকে ইসমাইল ও ইসহাককে দান করেছেন। আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রার্থনা শুনে থাকেন। "হে আমার প্রতিপালক, আমাকে সালাত কায়েমকারী করো

এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের প্রতিপালক, আমার প্রার্থনা কবুল করো। হে আমার প্রতিপালক, যেই দিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে সেই দিন আমাকে আমার পিতা মাতাকে এবং মুমিনগণকে ক্ষমা করো।" [সুরা ইবরাহিম : আয়াত ৩৯-৪১]

এই আয়াতগুলো পাঠ করার পর এক মুহূর্তের জন্যও কি কোনো ব্যক্তির এমন দুঃসাহস হতে পারে যে সে ওইসব অনর্থক ও প্রমাণহীন দাবিগুলোকে সত্য বলে মনে করে, যেগুলোকে ইউরোপের বিদ্বেষ-আক্রান্ত প্রাচ্যবিদগণ নিজেদের মূর্খতা অথবা ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বিবৃতির সঙ্গে ইলামি সমালোচনার শিরোনাম বানিয়েছে? এ-আয়াতগুলো কি মক্কী নয় এবং এ-আয়াতগুলোর মাধ্যমে কি সেসব কথাই প্রমাণিত হয় না যা মাদানি আয়াতসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে?

চার.

এভাবে সুরা ইবরাহিম ছাড়াও সুরা আন'আম ও সুরা আন-নাহলও মক্কি সুরা। এ-দুটিতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহিম আ. শিরকের মোকাবিলায় হানিফি ধর্মের প্রতি আহ্বানকারী ও দাওয়াত প্রদানকারী। আহ্বান ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট ও বিখ্যাত।

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

'আমি একনিষ্ঠভাবে তার দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।' [সুরা আন'আম : আয়াত ৭৯]

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (سورة الأنعام)

'বলো, "আমার প্রতিপালক তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। তাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, ইবরাহিমের ধর্মাদর্শ, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। [সুরা আন'আম : আয়াত ১৬১]

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ () شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (سورة النحل)

'ইবরাহিম ছিলো এক উম্মত, আল্লহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না; সে ছিলো আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য

কৃতজ্ঞ; আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছেন এবং তাকে পরিচালিত করেছেন সরল পথে। [সুরা আন-নাহল : আয়াত ১২০-১২১]

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (سورة النحل)

'এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহিমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করো; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না।' [সুরা আন-নাহল : আয়াত ১২৩]

তবে কি এসব দ্ব্যর্থহীন স্পষ্ট আয়াতের পরেও ওইসব প্রমাণের কোনো অর্থ থাকতে পারে যা স্নোগ ও তাঁর মতালম্বীরা এ-বিষয়ে বর্ণনা করেছেন? মক্কি সুরাই হোক, আর মাদানি সুরাই হোক—উভয় ক্ষেত্রেই হযরত ইবরাহিম আ.-এর ব্যক্তিত্ব একই রকম প্রতীয়মান হচ্ছে। উভয় অবস্থাতেই তিনি হানিফি দীনের দাওয়াত প্রদানকারী। হযরত ইসমাইল আ.-ও সমগ্র আরব জাতির আদি পিতা, পবিত্র কা'বাগৃহের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্মাতা এবং আরবদের পথপ্রদর্শক। সুতরাং ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদদের এই উক্তি—হযরত ইবরাহিম আ.-এর ব্যক্তিত্ব কুরআন মাজিদের মক্কি ও মাদানি আয়াতসমূহে ভিন্ন ভিন্ন পরিলক্ষিত হয়—সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং স্পষ্ট অপবাদ। তা ছাড়া এ-বক্তব্যও সত্যের বিপরীত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবে সর্বপ্রথম নবুওত দাবি করেন এবং তাঁর পূর্বে আরো কোনো নবীও অতীত হন নি। কেননা, হযরত ইবরাহিম আ., হযরত ইসমাইল আ., হযরত হুদ ও সালেহ আ. এ-ভূখণ্ডেরই পথপ্রদর্শক ও নবী ছিলেন।

জ্ঞানের ওই দাবিদারকে পক্ষপাতদুষ্টতা এমন মূর্খ করে দিয়েছে যে, কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন এ-কথাও চিন্তা করে না—এ-জাতীয় দাবির মাধ্যমে আমরা কেবল কুরআনের নয়, তাওরাতেরও মিথ্যা-প্রতিপাদন করছি। কারণ তাওরাতে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইসমাইল আ. হযরত ইবরাহিম আ.-এর পুত্র। আর ইসমাইল আ. আরব জাতির আদি পিতা এবং ইবরাহিম আ.-এর সন্তানদের মাধ্যমেই আরবভূমি আবাদ হয়েছে এবং এই পিতাপুত্র আরবভূমির দু-জন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

তা ছাড়া এই অপবাদও নিশ্চিত ভিত্তিহীন ও নিরর্থক যে, মক্কার জীবনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদি ও তাদের ধর্মের অনুসরণ করেছেন এবং মদিনায় পৌঁছে যখন ইহুদিদের অবিশ্বাস এবং তাদের বিরোধিতামূলক উত্তেজনা প্রত্যক্ষ করলেন, তখন ইহুদি থেকে স্বতন্ত্র

নতুন এক ইহুদি ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তাকে মিল্লাতে ইবরাহিম বা ইবরাহিমি ধর্মে আখ্যায়িত করেন। প্রাচ্যবিদদের এই দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ মক্কার জীবনে তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে ইহুদিদের কোনো সম্পর্কই ছিলো না। তাই বিরোধিতা, ঐকমত্য বা অনুকরণের প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য মদিনায় এসে তিনি মুশরিকদের চেয়ে ইহুদিদের প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদান করেছিলেন। তা এ-জন্য করেছিলেন যে, ইহুদিরা ইসলামের আকিদার অনুরূপ হযরত মুসা আ.-এর ধর্মের অনুসারী ছিলো, যদিও তাতে বিকৃতি এবং পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছিলো, কিন্তু তারা মুশরিকদের বিপরীতে তাওহিদ ও একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলো। আর তাদের পরিবর্তিত কিতাবে পরিবর্তনের পরেও অনেক বাক্য এমন থেকে গিয়েছিলো যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়া এবং ও তাঁর নবুওতের সাক্ষ্য ও প্রমাণ ছিলো। এসব বাণী থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদ প্রতীয়মান হয়। তা ছাড়া অনেক বিধি-বিধান এমনও ছিলো যা বিশুদ্ধ অর্থেই ওহির পর্যায়ভুক্ত এবং হযরত মুসা আ.-এর ধর্মের ভিত্তি ও বুনিয়াদ ছিলো। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধারণা করেছিলেন যে এরা মুশরিকদের তুলনায় তাড়াতাড়িই ইবরাহিমি ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ফেলবে। কিন্তু রাসুল যখন তাদের অস্বীকার, শত্রুতা ও বিদ্বেষের অভিজ্ঞতা লাভ করলেন, তখন তাদের সঙ্গে রাসুলের আচার-ব্যবহার সে-রকমই হয়ে গেলো, যে-রকম ছিলো মুশরিকদের সঙ্গে। অমুসলিম সবার ধর্মই এক অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধিতা—এই প্রতিপাদ্য অনুযায়ী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সবাইকে একই পর্যায়ে রাখলেন।

প্রিঙ্গার, স্নোগ এবং তাঁদের সমমতাবলম্বীরা এতটুকু পরিষ্কার কথা বুঝতেও অক্ষম অথবা ইচ্ছা করেই বুঝতে চান না যে, যেহেতু হযরত ইবরাহিম আ. ইসরাইল (ইয়াকুব) আ.-এর দাদা ছিলেন এবং ইহুদিরা তাদের ধর্মের সম্পর্ককে ইসরাইল আ.-এর প্রতি আরোপ করে এবং বনি ইসরাইল অর্থাৎ ইসরাইল আ.-এর বংশধর হওয়ার কারণে গর্ববোধ করে, সুতরাং তাদের এই উক্তি—হযরত ইবরাহিম আ.-ও ইহুদি ছিলেন—কেমন হাস্যকর উক্তি! পৌত্রের ধর্ম সম্পর্কে কখনো কি এ-

ধরনের কথা বলা যেতে পারে যে, দীর্ঘকাল পূর্বে অতীত দাদার ধর্ম পৌত্রের ধর্মের অনুগামী ছিলো?

এই সত্য প্রকাশ করার জন্যই কুরআন মাজিদ ঘোষণা করেছে—

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (سورة آل عمران)

'ইবরাহিম ইহুদি ছিলো না, খ্রিস্টানও ছিলো না; সে ছিলো একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্তও ছিলো না।' [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৬৭]

কিন্তু সেই অন্ধরা এ-আয়াতের এই অর্থ গ্রহণ করেছে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় তো ইহুদিদের ধর্মের ওপর ছিলেন। কিন্তু মদিনায় গিয়ে যখন দেখলেন ইহুদিরা তাঁকে নবী মানতে অস্বীকার করছে, তখন ইহুদিদের ধর্মের মুকাবিলায় নিজের স্বভাবসুলভ মেধার সাহায্যে ইবরাহিমের ইহুদি ধর্ম উদ্ভাবন করে নিয়েছেন। سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ [আল্লাহ পবিত্র, মহান। এ তো এক গুরুতর অপবাদ!]

স্নোগ ও তাঁর সমমতাবলম্বীরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পূর্বে আরবে কোনো নবী আসেন নি—এই দাবির প্রমাণে নিচের আয়াতটিও পেশ করেছেন—

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (سورة القصص)

'মুসাকে যখন আমি আহ্বান করেছিলাম তখন তুমি তুর পাহাড়ের পাশে উপস্থিত ছিলে না। বস্তুত তা[৫] তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দয়াস্বরূপ, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারো, যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসে নি, যেনো তারা উপদেশ গ্রহণ করে।' [সুরা কাসাস : আয়াত ৪৬]

তাঁরা বলেন, ইবরাহিম ও ইসমাইল আ. আরবের নবী হলে কুরআন মাজিদ আরবের উম্মতদের সম্পর্কে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এভাবে সম্বোধন করতো না।

---

[৫] অর্থাৎ ওহি, যা আল্লাহ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে প্রেরণ করে তাঁকে এমন সব বিষয়ে সংবাদ প্রদান করেছেন যা তিনি জানতেন না।

কিন্তু এটিও একটি জঘন্য ধোঁকা। কুরআন মাজিদের সম্বোধনরীতি, বর্ণনা-শৈলী এবং বাতিলপন্থীদের বাতিলপন্থার বিরুদ্ধে দলিলসমূহের বিন্যাস সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে এই ভুলের সৃষ্টি হয়েছে। অথবা, পূর্বে উল্লিখিত প্রশ্ন ও অভিযোগের মতো নিছক শত্রুতা, বিদ্বেষ ও বিরোধিতার কারণে এই ধোঁকার আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে সত্য এই যে, আরবের একটি অতি বড় অংশ মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিলো এবং এ-ধারাবাহিকতায় তারা আকিদা ও ধর্মের নাম দিয়ে কতগুলো বিধান তৈরি করে রেখেছিলো। যেমন : দেবতাদের উদ্দেশে মানত এবং কুরবানির জন্য সায়েবা, বাহিরা ও অসিলা ইত্যাদি উদ্ভাবন। তা ছাড়া তারা বিভিন্ন মূর্তির পূজার জন্য বিভিন্ন নিয়মনীতি স্থির করেছিলো। এ-কারণে যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে তাওহিদ ও ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং শিরক ও মূর্তিপূজা করতে বারণ করলেন, তখন তারা বলতে শুরু করলো, 'আমাদের ধর্ম খারাপ এবং আমাদের কোনো ইলহামি ধর্ম নেই— তোমার এ-ধরনের কথা বলা যে ভুল। কারণ আমাদের স্বতন্ত্র ধর্ম রয়েছে এবং তা আমাদের পূর্বপুরুষদের সনাতন ধর্ম।' আল্লাহপাক তাদের বক্তব্যকে কুরআনে উদ্ধৃত করেছেন এভাবে—

قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا (سورة الأعراف)

'তারা বলে, "আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে তা করতে (এই ধর্মের ওপর থাকতে) দেখেছি এবং আল্লাহও আমাদেরকে এর (এই ধর্মের) নির্দেশ দিয়েছেন।"' [সুরা আ'রাফ : আয়াত ২৮]

তখন কুরআন মাজিদ তাদের বাতিল আকিদার হাকিকতকে তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়ার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করলো যে কোনো ধর্মের আল্লাহর ধর্ম হওয়ার দুই ধরনের দলিলই হতে পারে : ১. উপলব্ধি ও জ্ঞানের মাধ্যমে এটা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় যে তা আল্লাহর ধর্ম এবং তাঁর প্রিয় ধর্ম; ২. অথবা উদ্ধৃত রেওয়ায়েতসমূহ তার সপক্ষে অকাট্য ও বিশ্বস্ত এবং অনস্বীকার্য প্রমাণ পেশ করে যে তা আল্লাহর প্রেরিত শরিয়ত। যদি কোনো দাবির পেছনে এ-দুই প্রকারের কোনো প্রকার দলিলই না থাকে, তবে সেই দাবিটি বাতিল এবং এমন দাবি উত্থাপনকারী মিথ্যাবাদী।

সুতরাং, কুরআন মাজিদ মুশরিকদের এই দাবি খণ্ডন করার জন্য কুরআনের আয়াতসমূহকে তিনভাগে ভাগ করে দিয়েছে। এক ভাগে

তাদের এই দাবিগুলোকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং দাবিগুলো যে অযৌক্তিক তা প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মুশরিকদের এমন উক্তি—وَاللّٰهُ أَمَرَنَا بِهَا— 'আল্লাহ আমাদেরকে এই ধর্মেরই (শিরকের) আদেশ করেছেন'—সম্পূর্ণ ভুল এবং আপাদমস্তক বাতিল। কেননা,

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (سورة الأعراف)

'আল্লাহ অশ্লীল আচরণের (অনর্থক ও বেহুদা কাজের) নির্দেশ দেন না। (হে মুশরিকরা,) তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমনকিছু বলছো (তাঁর ওপর এমন কথা আরোপ করছো) যা তোমরা জানো না?' [সূরা আ'রাফ : আয়াত ২৮]

আর দ্বিতীয় ভাগের আয়াতগুলো তাদের বাতিল দাবির সপক্ষে অনুভূতিগ্রাহ্য এবং যৌক্তিক প্রমাণ তলব করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, তারা যুক্তির মাধ্যমে এ-বিষয়টি প্রমাণ করুক যে তারা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে যা-কিছু ভুল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যার ওপর তাদের কল্পিত ধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, তা কীভাবে সঠিক হয়েছে এবং কীভাবে তা জ্ঞানীদের কাছে মেনে নেয়ার উপযোগী হয়েছে। কুরআন বলছে—

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ () أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ () أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ () وَلَدَ اللّٰهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ () أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ () مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ () أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (سورة الصافات)

'(হে মুহাম্মদ,) এখন তাদেরকে (মক্কার কাফেরদেরকে) জিজ্ঞেস করো, তোমার প্রতিপালকের জন্যই কি রয়েছে কন্যাসন্তান এবং তাদের জন্য পুত্রসন্তান? অথবা আমি কি ফেরেশতাদেরকে নারীরূপে সৃষ্টি করছিলাম আর তারা প্রত্যক্ষ করছিলো? (তারা কি তখন উপস্থিত ছিলো?) জেনে রাখো, তারা তো মনগড়া কথা বলে যে আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। তারা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী। তিনি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান পছন্দ করতেন? (হে মুশরিকরা) কী হয়েছে তোমাদের, তোমরা কেমন বিচার করো? (কেমন অবাস্তব হুকুম আরোপ করছো?) তবে কি তোমরা (কখনো) উপদেশ গ্রহণ করবে না।' [সূরা আস-সাফফাত : আয়াত ১৪৯-১৫৫]

আর তৃতীয় ভাগের আয়াতগুলোকে তাদের বাতিল আকিদা সম্পর্কে কিতাবি দলিল তলব করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। কুরআন মাজিদ তাদের জিজ্ঞেস করছে, তোমরা যা-কিছু বলছো এবং তাকে আল্লাহর

দীন বলে সাব্যস্ত করছো, তবে কি তোমাদের কাছে তার সপক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো দলিল বা প্রমাণ নাযিল হয়েছে? অথবা তাঁর কাছ থেকে কি এসব আকিদার সত্যায়নের জন্য কোনো কিতাব প্রেরণ করা হয়েছে? যদি এমন হয়ে থাকে তবে তা উপস্থিত করো। এ-ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে—

أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ () فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (سورة الصافات)

'তোমাদের কি সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ আছে? তাহলে (আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত) তোমাদের কিতাব উপস্থিত করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।' [সুরা আস-সাফফাত : আয়াত ১৫৬-১৫৭]

এখন যদি নিজেদের দাবি সত্যায়নের জন্য তাদের কাছে কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যৌক্তিক প্রমাণও না থাকে এবং উদ্ধৃতিযোগ্য সনদের ভিত্তিতে কোনো দলিল বা কিতাবও না থাকে, তাহলে তাদের দাবি— তাদের কাছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পূর্ব থেকেই আল্লাহর দীন বিদ্যমান এবং সুশৃঙ্খল শরিয়তও রয়েছে—সম্পূর্ণ বাতিল ও মিথ্যা দাবি।

এমনিভাবে মুশরিকদের কাছে এ-কথা প্রকাশ করার জন্য যে তোমাদের কাছে তোমাদের বাতিল দাবিগুলোর পক্ষে কোনো যৌক্তিক প্রমাণও নেই এবং কোনো কিতাবি দলিলও নেই এবং তাদেরকে নিরুত্তর করে দেয়ার জন্য সুরা আহকাফের মধ্যে প্রমাণ পেশের এই প্রন্থাই অবলম্বন করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

'বলো, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তাদের কথা ভেবে দেখেছো কি? আমাকে দেখাও তারা (ভূমি থেকে) পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করেছে অথবা আকাশমণ্ডলীতে তাদের কোনো অংশীদারিত্ব আছে কি? পূর্ববর্তী কোনো কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোনো জ্ঞান থাকলে তা তোমরা আমার কাছে (তোমাদের দাবির সমর্থনে) উপস্থিত করো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' [সুরা আহকাফ : আয়াত ৪]

এটাই সেই তত্ত্ব যাকে ভিন্ন এক ভঙ্গিতে কুরআন মাজিদের ওইসব আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে এ-কথা প্রকাশ পায় যে, আরবের মুশরিকদের কাছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর

পূর্বে আর কোনো নবী আসেন নি। এসব আয়াতের অর্থ কখনো এমন হতে পারে না যে, আরবভূমি হেজায সবসময়ের জন্য আল্লাহর নবী ও রাসুলগণের আগমন থেকে বঞ্চিত ছিলো এবং সে-রাজ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আওয়াজই সর্বপ্রথম আওয়াজ। কুরআন মাজিদ এমন সত্যবিরোধী কথা কেমন করে বলতে পারে যখন সুরা ইবরাহিম, সুরা আনআম, সুরা আন-নাহলের আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহিম ও হযরত ইসমাইল আ.-এর আরবি নবী হওয়ার পরিষ্কার ও স্পষ্ট সাক্ষ্য বিদ্যমান রয়েছে, যা একটু আগে উল্লেখ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে কুরআন মাজিদ এ-জাতীয় পরস্পরবিরোধী বক্তব্য ও বৈপরীত্যপূর্ণ উক্তি থেকে নিশ্চিতরূপে পবিত্র যে তা এক জায়গায় একটি কথাকে অস্বীকার করবে এবং অন্য এক জায়গায় সেই একই কথাকে স্বীকার করবে। কেননা, তা দৃশ্য ও অদৃশ্য এবং গায়েব ও হাজির সম্পর্কে জ্ঞানবান আল্লাহ তাআলার কালাম; ভুলভ্রান্তিযুক্ত মানুষের কথা নয়। কারণ আল্লাহপাক বলেন—

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

'তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে অনুধাবন করে না? (গভীর চিন্তা-ভাবনা করে দেখে না?) যদি তা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকারো কাছ থেকে আসতো (অন্যকারো কালাম হতো) তবে তারা তাতে অনেক অসঙ্গতি পেতো।' [সুরা নিসা : আয়াত ৮২]

সুতরাং কুরআন মাজিদের বিরুদ্ধে স্প্রিঙ্গার, স্লোগ এবং উইনসিঙ্ক-এর এসব উদ্ভট দাবি এবং তাদের উপস্থাপিত প্রমাণসমূহ ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্য ঘটনাবলির আলোকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল এবং মিথ্যা। তাদের কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছে যে এঁরা এবং এই প্রজাতির অন্য সমালোচকগণ কুরআন মাজিদ সম্পর্কে সততা ও সুবিচারের সঙ্গে সমালোচনা করেন না। অথচ তাঁদের বোধশক্তি ও বোধগম্যতায় কোনো ত্রুটি নেই; বরং এর বিপরীতে তাঁরা জেনে-শুনে অসৎ ও অসাধুতাপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করে কুরআন মাজিদের বিরুদ্ধে বিষ উদ্গীরণ করছেন, ভুল দোষারোপ করছেন, স্পষ্ট ও প্রকাশ্য বিষয়গুলোতে নিজেদের অভিপ্রায় অনুসারে জটিলতা সৃষ্টি করে অজ্ঞ দুনিয়াকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। এ-জাতীয় দোষারোপে তাঁদের কেবল একটিমাত্র উদ্দেশ্য থাকতে, যাকে কুরআন এই শ্রেণির বিরোধীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রীতি হিসেবে বর্ণনা করেছে—

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً (سورة النساء)

'তারা (কুরআন ও ইসলাম অবিশ্বাসকারী লোক) এটাই কামনা করে যে (কতই না ভালো হতো) তারা যেমন কুফরি করেছে তোমরাও তেমন কুফরি করো, যাতে তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও।' [সুরা নিসা : আয়াত ৮৯]

সুতরাং এসব অবিশ্বাসকারী কাফেরদের মোকাবিলায় মুসলমানদের সবসময় একটিমাত্র জবাব রয়েছে—

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

(سورة آل عمران)

'হে আমাদের প্রতিপালক, সরলপথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্ত রকে সত্য লঙ্ঘনপ্রবণ করো না (বক্রতার দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ো না) এবং তোমার কাছ থেকে আমাদেরকে করুণা দাও, নিশ্চয় তুমি মহাদাতা।' [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৮]

যাইহোক, কুরআন মাজিদের উপরিউক্ত আলোচ্য আয়াতটির অর্থ খুব পরিষ্কার ও স্পষ্ট এবং তার মধ্যে ও সুরা আনআম, সুরা নাহল ও সুরা ইবরাহিমের অনুরূপ সুরাগুলোতে হযরত ইবরাহিম আ.-এর আরবের নবী হওয়ার মধ্যে নিশ্চিতভাবে কোনো বিরোধ ও বৈপরীত্য নেই।

এখানে বর্ণিত বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিবরণ ছাড়াও সাধারণ মুফাস্‌সিরগণ এ-জাতীয় আয়াতগুলোর অর্থ এমন বর্ণনা করেছেন যে, এই সম্বোধন কেবল ওইসব লোকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবদ্দশায় বিদ্যমান ছিলো। তাদের অতীত পূর্বপুরুষ এবং আরবের অতীতকালের ইতিহাসের সঙ্গে এই সম্বোধনের কোনো সম্পর্ক নেই।

কুরআন মাজিদে হযরত ইবরাহিম আ.-এর আলোচনা

কুরআন মাজিদের হেদায়েত ও নসিহতের পয়গায় যেহেতু ইবরাহিমি ধর্মেরই পয়গাম, তাই কুরআন জায়গায় জায়গায় হযরত ইবরাহিম আ.-এর কথা উল্লেখ করেছে। আর পূর্বের আলোচনায় যেমন বলা হয়েছে যে হযরত ইবরাহিম আ.-এর উল্লেখ ও আলোচনা মক্কি ও মাদানি উভয় সুরাসমূহে রয়েছে। নিম্নবর্ণিত ছকটিতে সেসব সুরা ও আয়াত প্রকাশ করা হচ্ছে :

সুরা	সুরার নাম	আয়াত-সংখ্যক
২	সুরা আল-বাকারা	১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১৩০, ১৩২, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৬, ১৪০, ১৫৮, ২৬০
৩	সুরা আলে ইমরান	৩৩, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৮৪, ৯৫, ৯৭
৪	সুরা আন-নিসা	৫৪, ১২৫, ১৬৩
৬	সুরা আল-আন'আম	৭৪, ৭৫, ৮৩, ১৬১
৯	সুরা আত-তাওবা	৭০, ১১৪
১১	সুরা হুদ	৬৯, ৭৪, ৭৫, ৭৬
১২	সুরা ইউসুফ	৬, ৩৮
১৪	সুরা ইবরাহিম	৩৫
১৫	সুরা আল-হিজর	৫১
১৬	সুরা আন-নাহল	১২০, ১২৩
১৯	সুরা মারইয়াম	৪১, ৪৬, ৫৮
২১	সুরা আল-আম্বিয়া	৫১, ৬০, ৬২, ৬৯
২২	সুরা আল-হাজ	২৬, ৪৩, ৭৮
২৬	সুরা আশ-শুআরা	৬৯
২৯	সুরা আল-আনকাবুত	১৬, ৩১
৩৩	সুরা আল-আহযাব	৭
৩৭	সুরা আস-সাফ্ফাত	৮৩, ১০৪, ১০৯
৩৮	সুরা সোয়াদ	৪৫
৪২	সুরা আশ-শুরা	১৩
৪৩	সুরা আয-যুখরুফ	২৬
৫১	সুরা আয-যারিয়াত	২৪
৫৩	সুরা আন-নাজম	৩৭
৫৭	সুরা আ-হাদিদ	২৬
৬০	সুরা আল-মুমতাহিনা	৪
৮৭	সুরা আল-আ'লা	১৯
মোট ২৫ সুরা		৬৩ আয়াত

হযরত ইবরাহিম আ.-এর ঘটনাবলির সঙ্গে অন্য কতিপয় আম্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনাবলিও সংশ্লিষ্ট হয়েছে। যেমন, হযরত নুহ আ.-এর ঘটনা। কারণ তিনি হযরত ইবরাহিম আ.-এর ভাতিজাও এবং তাঁর

অনুগামীও। এমনিভাবে ইবরাহিম আ.-এর পুত্রদ্বয় হযরত ইসমাইল ও হযরত ইসহাক আ.-এর ঘটনাবলিও সংশ্লিষ্ট। কেননা, হযরত ইসমাইল আ.-এর জন্মকালে ইবরাহিম আ.-এর বয়স ছিলো ৮৭ বছর এবং হযরত ইসহাক আ.-এর জন্মকালে তাঁর বয়স ছিলো পূর্ণ ১০০ বছর। আর হযরত ইবরাহিম আ.-এর পূর্ণ আয়ুষ্কাল ছিলো ১৭৫ বছর। কিন্তু এই তিনজন নবীর বিস্তারিত ঘটনাবলি স্বতন্ত্র শিরোনামায় উল্লেখ করা হবে। আর এখানে কেবল হযরত ইবরাহিম আ.-এর কাহিনির প্রসঙ্গে কোনো কোনো স্থানে ওই দুইজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত ইবরাহিম আ.-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব

হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর উচ্চ মর্যাদার প্রেক্ষিতে—যা তাঁকে অন্য আম্বিয়ায়ে কেরামের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছে—কুরআন মাজিদ তাঁর ঘটনাবলিকে জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন শৈলীতে বর্ণনা করেছে। এক স্থানে যদি সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হয়ে থাকে তাহলে অন্য জায়গায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কতিপয় স্থানে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির প্রেক্ষিতে তাঁর ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বলরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এ-কারণে যথাযথ বিন্যাসের সঙ্গে সেগুলোকে পেশ করা হচ্ছে।

তাওরাত বলছে যে হযরত ইবরাহিম আ. ইরাকের ছোট শহর 'আওর'-এর অধিবাসী এবং ফাদ্দান গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁর সম্প্রদায় ছিলো মূর্তিপূজক। তাঁর পিতা কাঠমিস্ত্রির কাজ করতেন এবং নিজের সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোত্রের জন্য কাঠের মূর্তি নির্মাণ করে বিক্রি করতেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহিম আ.-কে প্রথম থেকেই সত্যের উপলব্ধি এবং সত্য পথের সন্ধান ও হেদায়েত দান করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মূর্তিগুলো শুনতে পারে না, দেখতেও পারে না এবং কারো ডাকে সাড়াও দিতে পারে না এবং ক্ষতি ও উপকার সাধনের সঙ্গেও তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আর কাঠের এই পুতুলগুলো এবং হস্তনির্মিত অন্য বস্তুগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্যও নেই। তিনি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় নিজের চোখে দেখতেন যে তাঁর পিতা নিজের হাতে ওসব নিষ্প্রাণ মূর্তিগুলোকে নির্মাণ করে থাকেন এবং যেভাবে তাঁর মর্জি হয় সেভাবেই মূর্তিগুলোর নাক, কান, চোখ ও দেহাবয়ব কেটে-চেঁছে তৈরি করে থাকেন। তারপর সেগুলোকে ক্রেতার কাছে বিক্রি করে থাকেন।

সুতরাং এই মূর্তিগুলো কি মাবুদ (উপাস্য) হতে পারে? কিংবা এগুলোকে কি মাবুদ বা খোদার সমতুল্য ও সমকক্ষ বলা যেতে পারে? কখনো না। এরপর তিনি নবুওত লাভ করে সর্বপ্রথম এদিকে মনোনিবেশ করলেন।

নবুওতপ্রাপ্তি

কুরআন মাজিদ হযরত ইবরাহিম আ.-এর জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলনকারী হেদায়েত ও সৎপথ প্রাপ্তির বিষয় এভাবে বর্ণনা করছে—

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ () إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ () قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ () قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ () قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ () قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (سورة الأنبياء)

'আমি তো এর পূর্বে (প্রথম থেকেই) ইবরাহিমকে (হেদায়েত ও) সৎপথের জ্ঞান দান করেছিলাম এবং আমি তার (কার্যকলাপ) সম্পর্কে ছিলাম সম্যক অবগত। যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বললো, "এই মূর্তিগুলো কী যার পূজায় তোমরা লিপ্ত রয়েছো!" তারা বললো, "আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এদের পূজা করতে দেখেছি।" সে বললো, "তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণও রয়েছে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।" তারা বললো, "তুমি কি আমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছো না তুমি কৌতুক করছো?" (এমনি এমনি বিদ্রূপকারীদের মতো কথা বলছো?) সে বললো, "না, (এসব মূর্তি তোমাদের প্রতিপালক নয়, বরং) তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালক, তিনি সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন এবং এ-বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী।"'
[সুরা আম্বিয়া : আয়াত ৫১-৫৬]

যখন এই মর্যাদাশালী ব্যক্তিত্বের ওপর আল্লাহপাকের অবারিত অনুগ্রহ ও দানের স্রোত অবিরাম ধারায় দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হচ্ছিলো, তখন এর ফল এই দাঁড়ালো যে, তিনি আম্বিয়ায়ে কেরামের সারিতে বিশিষ্ট স্থান লাভ করলেন এবং তাঁর দাওয়াত ও তাবলিগের উৎসস্থল ও কেন্দ্রটি 'হানিফি ধর্ম' নামে অভিহিত হলো।

যখন তিনি দেখলেন যে তাঁর সম্প্রদায় মূর্তিপূজা, নক্ষত্রপূজা এবং বিভিন্ন জড় পদার্থের পূজায় এমনভাবে নিরত রয়েছে যে আল্লাহ তাআলার

অসীম কুদরত এবং তাঁর একত্ব ও অমুখাপেক্ষিতার কল্পনাও তাদের অন্তরে অবশিষ্ট নেই এবং তাদের কাছে আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাসের চেয়ে অধিক বিস্ময়কর ও আজগুবি বিষয় আর কিছুই নেই। এমন সময় হযরত ইবরাহিম আ. অত্যন্ত সাহসের কোমর বাঁধলেন এবং এক আল্লাহর ওপর ভরসা করে সম্প্রদায়ের সামনে সত্যের বাণী উপস্থিত করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন :

'হে আমার সম্প্রদায়, এ আমি কী দেখছি? তোমরা নিজেদের হাতে নির্মিত মূর্তিসমূহের পূজায় লিপ্ত রয়েছে। তোমরা কি এমনই অজ্ঞতার নিদ্রায় বিভোর রয়েছে যে সেসব নিষ্প্রাণ কাঠকে নিজেদের যন্ত্রপাতির সাহায্যে কেটে-চেঁছে মূর্তি প্রস্তুত করছো এবং তা যদি তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী গঠিত না হয় তবে তা ভেঙে অন্য একটি তৈরি করছো। তৈরি করার পর কাঠের ওই মূর্তিগুলোকেই পূজা করতে থাকো এবং উপকার ও ক্ষতি সাধনের মালিক মনে করতে থাকো। তোমরা এসব অনর্থক কাজ থেকে বিরত হও। আল্লাহর একত্ববাদের স্তুতি গাও এবং একমাত্র সেই প্রকৃত মালিকের সামনে বিনয়ের সঙ্গে মস্তক অবনত করো, যিনি আমার ও তোমাদের এবং গোটা বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও মালিক।'

কিন্তু কওম তাঁর আহ্বানের প্রতি সামান্যও কর্ণপাত করলো না। আর যেহেতু তারা সত্য শ্রবণকারী কান ও সত্য দর্শনকারী চোখ থেকে বঞ্চিত ছিলো, ফলে তারা এমন উচ্চ মর্যাদাশীল নবীর সত্যের দাওয়াত নিয়ে উপহাস করতে লাগলো এবং অধিক নাফরমানি ও অবাধ্যতা করতে শুরু করলো।

পিতাকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান এবং পিতা-পুত্রের বিতর্ক

হযরত ইবরাহিম আ. দেখলেন যে শিরকের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র তার নিজের ঘরে বিদ্যমান। তাঁর পিতা আযারের মূর্তিনির্মাণ ও মূর্তিপূজা গোটা কওমের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র ও মেরুদণ্ড হয়ে রয়েছে। সুতরাং এটাই সুকৌশল হবে যে সত্যের প্রতি আহ্বান এবং সত্য প্রচারকাজের কর্তব্যপালন নিজের ঘর থেকেই শুরু করা। তাই ইবরাহিম আ. সর্বপ্রথম নিজের পিতা আযারকেই লক্ষ করে বললেন, বাবা, আল্লাহ ইবাদত ও আল্লাহকে চেনার জন্য আপনি যে-পন্থা অবলম্বন করেছেন এবং যাকে পূর্বপুরুষদের প্রাচীন পন্থা বলে থাকেন, তা প্রকাশ্য ভ্রান্তি এবং বাতিল অবলম্বনের পন্থা। সিরাতুল মুস্তাকিম, সরল ও সঠিক পথ তা-ই যার

প্রতি আমি আহ্বান করছি। বাবা, এক আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করাই মুক্তি ও নাজাতের উৎস; আপনার হাতে-গড়া এসব মূর্তির পূজা ও উপাসনা করা নয়। আপনি এই পন্থা ত্যাগ করুন এবং আল্লাহর একত্বের পথকে দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করুন। তাহলে আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য লাভ করতে পারবেন।

কিন্তু আফসোস! আযারের ওপর হযরত ইবরাহিম আ.-এর ওয়াজ-নসিহত এবং উপদেশের কোনো ক্রিয়াই হলো না। বরং সে সত্য গ্রহণ করার পরিবর্তে তার পুত্রকে ধমকাতে লাগলো। বলতে লাগলো, তুমি যদি মূর্তিসমূহের নিন্দাবাদ থেকে বিরত না থাকো তাহলে আমি তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করে খুন করে ফেলবো। ইবরাহিম আ. যখন এমন অবস্থা দেখলেন যে বিষয়টি সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে—একদিকে যদি পিতার সম্মান রক্ষা করার প্রশ্ন হয়, তবে অন্যদিকে কর্তব্যপালন, সত্যের সংরক্ষণ এবং আল্লাহর আদেশ পালনের প্রশ্ন। সুতরাং তিনি চিন্তা করলেন এবং শেষ পর্যন্ত তা-ই করলেন যা তাঁর মতো একজন মনোনীত মানুষ এবং আল্লাহর উচ্চ মর্যাদাশীল নবীর মর্যাদার উপযোগী ছিলো। তিনি তাঁর পিতার কঠোর উক্তির উত্তর কঠোরতার সঙ্গে দিলেন না, হীনতা ও নীচতার পথ অবলম্বন করলেন না; বরং নম্রতা, ভদ্রতা, কোমলতা এবং মহান চরিত্রের সঙ্গে উত্তর দিলেন। তিনি বললেন, বাবা, যদি আমার দাওয়াতের জবাব এমনই হয় তাহলে তোমার প্রতি সালাম, আমি পৃথক হয়ে যাচ্ছি। আমি আল্লাহর সত্যধর্ম ত্যাগ করতে পারি না এবং কোনো অবস্থাতেই মূর্তিসমূহের পূজা করতে পারি না। আমি আজ থেকে আপনার সংশ্রব থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আপনার অগোচরে আপনার জন্য আল্লাহপাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবো। যাতে আপনার হেদায়েত লাভের সৌভাগ্য হয় এবং আপনি আল্লাহর আযাব থেকে নাজাত পান। এই ঘটনা সুরা মারইয়ামে বিবৃত হয়েছে এভাবে—

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا () إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا () يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا () يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ

عَصِيًّا () يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا () قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا () قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا () وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا (سورة مريم)

'(হে মুহাম্মদ,) স্মরণ করো, এই কিতাবে উল্লিখিত ইবরাহিমের কথা; সে ছিলো সত্যনিষ্ঠ, নবী। (স্মরণ করো সেই সময়ের কথা,) যখন সে তার পিতাকে বললো, "হে আমার পিতা, তুমি কেনো তার (এমন একটি পদার্থের) ইবাদত করো যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোনোই কাছে আসে না? হে আমার পিতা, আমার কাছে তো এসেছে জ্ঞান (জ্ঞানের আলো) যা তোমার কাছে আসে নি; সুতরাং আমার অনুসরণ করো, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাবো। হে আমার পিতা, শয়তানের ইবাদত (দাসত্ব) করো না। শয়তান তো দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা, আমি তো আশঙ্কা করি যে দয়াময়ের শাস্তি তোমাকে স্পর্শ করবে, তখন তুমি হয়ে পড়বে শয়তানের বন্ধু।" (এসব কথা শুনে) পিতা[৬] বললো, "হে ইবরাহিম, তুমি কি আমার দেব-দেবী থেকে বিমুখ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তাহলে আমি পাথরের আঘাতে তোমার প্রাণ বধ করবোই; তুমি (যদি নিজের ভালো চাও তাহলে) চিরদিনের জন্য আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও।" ইবরাহিম বললো, "তোমার প্রতি সালাম।[৭] (আমি পৃথক হয়ে যাচ্ছি।) আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো, নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। আমি তোমাদের থেকে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করো তাদের থেকে পৃথক হচ্ছি; আমি আমার প্রতিপালককে আহ্বান করি; আশা করি, আমার প্রতিপালককে আহ্বান করে আমি ব্যর্থকাম হবো না।"' [সুরা মারইয়াম : আয়াত ৪১-৪৮]

হযরত ইবরাহিম আ. পিতা আযারকে নসিহত করার ঘটনাটি সুরা আন'আমে নিম্নরূপে উল্লেখ করা হয়েছে—

[৬] এখানে قَالَ ক্রিয়ার কর্তা হযরত ইবরাহিম আ.-এর পিতা।

[৭] এখানে سَلَامٌ-এর অর্থ অভিভাবদন নয়, বিদায় গ্রহণ।—কাশশাফ, জালালাইন, কুরতুবি ইত্যাদি।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

স্মরণ করো, (সেই সময়ের কথা, যখন) ইবরাহিম তার পিতা আযারকে বলেছিলো, "আপনি কি মূর্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ (সাব্যস্ত) করেন? আমি আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।" [সুরা আন'আম : আয়াত ৭৪]

কওমকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান এবং তাদের সঙ্গ বিতর্ক

পিতা ও পুত্রের মধ্যে ঐক্য সাধিত হওয়ার যখন কোনো উপায় থাকলো না এবং আযার কোনোক্রমেই হযরত ইবরাহিম আ.-এর দাওয়াত ও নসিহত কবুল করলো না, তখন হযরত ইবরাহিম আ. আযার থেকে পৃথক হয়ে গেলেন এবং সত্যের দাওয়াত ও দীন প্রচারকে আরো ব্যাপক করে তুললেন। এখন কেবল আযারই তাঁর সম্বোধিত ব্যক্তি থাকলো না; বরং গোটা সম্প্রদায়কে তিনি তাঁর সম্বোধনের লক্ষ্যস্থল বানিয়ে নিলেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলো না। তাঁরা হযরত ইবরাহিম আ.-এর কোনো কথাই শুনলো না এবং সত্যের দাওয়াতের সামনে নিজেদের বাতিল উপাস্যগুলোর মতোই বোবা, অন্ধ ও বধির হয়ে থাকলো। তাদের কান ছিলো; কিন্তু সত্যের আওয়াজ শোনার জন্য তা বধির ছিলো। তাদের চোখের মণিগুলো চক্ষুগোলকের ভেতর জীবিত মানুষের মতো অবশ্যই নড়াচড়া করতো; কিন্তু সত্য দর্শন থেকে তা বঞ্চিত ছিলো। তাদের মুখ অবশ্যই বাক্‌শক্তিসম্পন্ন ছিলো; কিন্তু সত্য কথা উচ্চারণ করতে তা বোবা ছিলো। এই মর্মে কুরআন মাজিদে আল্লাহ্ বলেন—

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (سورة الأعراف)

'আমি বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা শোনে না; এরা পশুর মতো, বরং এরা অধিক বিভ্রান্ত। এরাই গাফেল। (তারা গাফলত ও অমনোযোগিতার মধ্যে মত্ত ও বিহ্বল।) [সুরা আ'রাফ : আয়াত ১৭৯]

আর যখন হযরত ইবরাহিম আ. তাদেরকে জোরে-শোরে জিজ্ঞেস করলেন, বলো তো, তোমরা যাদের পূজা করছো তারা তোমাদের কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে কি? তারা বললো, আমরা এসব বিষয়ের তর্কবিতর্ক ও বিতণ্ডায় লিপ্ত হতে চাই না। আমরা তো এটাই জানি যে আমাদের পিতৃপুরুষগণ এই-ই করে আসছেন। সুতরাং আমরাও তা-ই করছি। তখন হযরত ইবরাহিম আ. এক বিশেষ পদ্ধতিতে এক আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলতে লাগলেন, আমি তোমাদের এসব মূর্তিকে আমার দুশমন মনে করছি। অর্থাৎ তাদের থেকে নির্ভীক হয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। এরা যদি আমার কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম হয়, তবে নিজেদের শখ মিটিয়ে ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে নিক।

অবশ্য আমি কেবল সেই সত্তাকে আমার মালিক মনে করছি, যিনি গোটা বিশ্বজগতের প্রতিপালক। তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সত্য ও সরল পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি আমাকে খাদ্য ও পানীয় দান করেন এবং রিযিক প্রদান করেন। আর যখন আমি রুগ্ণ হয়ে পড়ি তখন তিনি আমাকে সুস্থতা দান করেন। তিনি আমার জীবন ও মৃত্যুর মালিক। আর আমি কোনো অপরাধ বা ভুল করে ফেললে তাঁর দরবারে আশা রাখি যে তিনি আমাকে কিয়ামতের দিন ক্ষমা করে দেবেন। আর আমি তাঁর দরবারে এই প্রার্থনা করছি যে, হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে সঠিক মীমাংসার শক্তি দান করুন। আর আমাকে মুখের সত্যতা দান করুন। আর আমাকে জান্নাতুন নাঈমের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

উপদেশ ও নসিহতের ক্রিয়াশীল পদ্ধতি, যা হযরত ইবরাহিম আ. তাঁর পিতা ও সম্প্রদায়ের সামনে পেশ করেছিলেন, সুরা শুআরায় বিস্ত ারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে—

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ () إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ () قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ () قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ () أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ () قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ () قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ () أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ () فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ () الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ () وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ () وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ () وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ () وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ () رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي

بِالصَّالِحِينَ () وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ () وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ () وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ () وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ () يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ () إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (سورة الشعراء)

'তাদের কাছে ইবরাহিমের বৃত্তান্ত বর্ণনা করো। সে যখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিলো, "তোমরা কীসের ইবাদত করো?" তারা বললো, "আমরা মূর্তির পূজা করি এবং আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের পূজায় নিরত থাকবো।" সে বললো, "তোমরা প্রার্থনা করলে ওরা কি শোনে? অথবা ওরা কি তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করতে পারে?" তারা বললো, "না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এরূপই করতে দেখেছি।" সে বললো, " তোমরা কি ভেবে দেখেছো কীসের পূজা করছো—তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষেরা (অর্থাৎ যারা পূজা করতো)? তারা সবাই আমার শত্রু, জগতসমূহের প্রতিপালক ব্যতীত; যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করেন। তিনিই আমাকে দান করেন আহার ও পানীয়; এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন; এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর পুনর্জীবিত করবেন। এবং আশা করি, তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধ মার্জনা করে দেবেন। হে আমার প্রতিপালক, আমাকে জ্ঞান দান করো এবং সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে শামিল করো। আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী করো (তারা যেনো আমার ঘটনাবলি স্মরণ করে) এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের (জান্নাতুন নাঈমের) অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো, আর আমার পিতাকে ক্ষমা করো, তিনি তো পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এবং আমাকে লাঞ্ছিত করো পুনরুত্থান দিবসে, যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না; সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আল্লাহর কাছে আসবে বিশুদ্ধ (ব্যাধিমুক্ত) অন্তর নিয়ে।"' (সে-ই হবে সফলকাম।) [সূরা শুআরা : আয়াত ৬৯-৮৯]

কিন্তু আযার ও আযারের সম্প্রদায়ের অন্তর সত্যকে গ্রহণ করার জন্য কোনোক্রমেই নরম হলো না এবং তাদের অবিশ্বাস ও অস্বীকৃতি সীমা ছাড়িয়ে যেতে লাগলো।

ইতোপূর্বে তো এ-কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে হযরত ইবরাহিম আ.-এর সম্প্রদায় মূর্তিপূজার সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রেরও পূজা করতো এবং তাদের এই

বিশ্বাস ছিলো যে, মানুষের মৃত্যু ও জীবন, তাদের রিযিক, তাদের লাভ-লোকসান, প্রাচুর্য ও দুর্ভিক্ষ, জয়-পরাজয়—মোটকথা জগতের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের শৃঙ্খলা নক্ষত্রসমূহ এবং তাদের গতিবিধির প্রভাবেই চলছে ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং এই প্রভাব নক্ষত্রদের নিজস্ব গুণাবলির অন্তর্গত। সুতরাং তাদের সন্তুষ্ট রাখা অবশ্য কর্তব্য। আর এটা তাদের পূজা করা ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং, হযরত ইবরাহিম আ. যেভাবে তাদের নিম্নজগতের উপাস্যগুলোর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে দিয়ে তাদেরকে সত্যপথে আহ্বান করলেন, তেমনি আবশ্যক মনে করলেন যে, উর্ধ্বজগতের বাতিল উপাস্যগুলোর অস্থায়িত্ব ও ধ্বংসশীল হওয়ার দৃশ্য তাদের সামনে পেশ করে এ-তথ্যটিও তাদের জানিয়ে দেন যে, এটা তোমাদের নিশ্চিত ভ্রান্ত ধারণা যে, এই উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহগুলোর খোদায়ি শক্তির আধিপত্য রয়েছে। কখনো নয়; তা ভুল ধারণা ও ভুল বিশ্বাস। কিন্তু বাতিল উপাস্যের পুজকেরা নিজেদের হাতে নির্মিত মূর্তিকে এতটাই ভয় করতো যে তাদের নিন্দাকারীদের জন্য এটা কল্পনা করতো যে তারা মূর্তিগুলোর ক্রোধে পতিত হয়ে ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে। এই কল্পনার পূজারীদের অন্তরে উর্ধ্বজগতের নক্ষত্রপূজার বিরুদ্ধে প্রেরণা সৃষ্টি করা কোনো সহজ কাজ ছিলো না। তাই মুজাদ্দিদে আম্বিয়া হযরত ইবরাহিম আ. তাদের মস্তিষ্কের উপযোগী এক বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক বর্ণনাপদ্ধতি অবলম্বন করলেন।

নক্ষত্রখচিত রাত ছিলো। একটি নক্ষত্র ছিলো অত্যন্ত উজ্জ্বল। হযরত ইবরাহিম আ. ওটাকে দেখে বললেন, আমার রব কি এটি? কোনো নক্ষত্র যদি রব বা খোদা হওয়ার শক্তি রেখে থাকে, তাহলে এটি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট এবং উজ্জ্বল। কিন্তু ওটা যখন নিজের নির্ধারিত সময়ে দৃষ্টির বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেলো এবং ওটার এতটুকু সাধ্য হলো না যে আরো কিছু সময় অন্য নক্ষত্রগুলোর জন্য নিজের দীপ্তি প্রকাশ করে এবং বিশ্বজগতের শৃঙ্খলার ব্যত্যয় ঘটিয়ে নিজের পূজারীদের পরিদর্শনের কেন্দ্রস্থ হয়ে থাকতে পারে। তখন হযরত ইবরাহিম আ. বললেন, আমি আত্মগোপনকারীদেরকে পছন্দ করি না। অর্থাৎ, যেসব জিনিস পরিবর্তনের প্রভাবে আমার চেয়েও অধিক প্রভাবিত হয় এবং যা তাড়াতাড়িউ ওইসব পরিবর্তনের প্রভাব গ্রহণ করে, কেমন করে সেগুলো আমার উপাস্য হতে পারে।

আবার দৃষ্টিপাত করে তিনি দেখতে পেলেন যে চাঁদ ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তির সঙ্গে সামনে উদিত।[৮] তিনি চাঁদকে দেখে বললেন, এটিই কি আমার রব? কেননা, এটি খুব উজ্জ্বল এবং নিজের কোমল আলোয় গোটা বিশ্বকে আলোময় করে দিয়েছে। সুতরাং নক্ষত্রসমূহকে যদি মাবুদ বানানোই হয় তবে কেনো এই চাঁদকেই মাবুদ বানানো হবে না? কারণ এটিকেই খোদা হওয়ার অধিক উপযোগী দেখা যাচ্ছে।

ভোর ঘনিয়ে এলো। ধীরে ধীরে চাঁদের আলোও নিষ্প্রভ হয়ে আসতে লাগলো। চাঁদেরও আত্মগোপন করার সময় হয়ে এলো। আর যতই সূর্যোদয়ের সময় ঘনিয়ে আসতে লাগলো ততই চাঁদের অস্তিত্ব দর্শকদের দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে যেতে লাগলো। এই অবস্থা দেখে হযরত ইবরাহিম আ. একটি বাক্য বললেন, যাতে চাঁদের খোদা হওয়ার ওপর নেতিবাচক পর্দা টেনে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে কওমের দৃষ্টি এক আল্লাহর অস্তি ত্বের দিকে এমন নীরবতার সঙ্গে ফিরিয়ে দেয়া হয় যে কওম তা অনুভবই করতে পারে না। আর সেই কথোপকথনের যে-একটিমাত্র উদ্দেশ্য, অর্থাৎ এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, অনিচ্ছাকৃতভাবেই তা তাদের হৃদয়ে দৃঢ় হয়ে যায়। ইবরাহিম আ. বললেন, আমার প্রকৃত প্রতিপালক যদি আমাকে পথ প্রদর্শন না করতেন, তবে আমিও অবশ্যই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়তাম। এতটুকু বলেই তিনি নীরব হয়ে গেলেন। কেননা, এই শৃঙ্খলের আরো একটি কড়া এখনো অবশিষ্ট রয়েছে এবং কওমের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য আরো একটি অস্ত্র বাকি আছে। সুতরাং এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু করা সমীচীন ছিলো ন।

নক্ষত্রপূর্ণ রাতের অবসান ঘটলো। চাঁদ, তারা সবকিছু দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো কেনো? তা এইজন্য যে, গোটা বিশ্বজগৎকে আলোয় উদ্ভাসিতকারী সূর্যের দীপ্তিমান চেহারা এখন উদিত হচ্ছে। দিবস উদ্ভাসিত হলো এবং সূর্য পূর্ণ আলো ও দীপ্তির সঙ্গে দেদীপ্যমান হতে লাগলো।

হযরত ইবরাহিম আ. সূর্যকে দেখে বললেন, এটিই আমার রব। কেননা, গ্রহরাজির মধ্যে এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সৌরজগতে এর চেয়ে বড় গ্রহ আমার চোখের সামনে দ্বিতীয়টি নেই। কিন্তু গোটা দিবস আলোকময় ও

---

[৮] কুরআন মাজিদে এ-কথার উল্লেখ নেই যে এই কথোপকথন কয়েক রাতে হয়েছিলো না-কি একই রাতে। যদি একই রাতে হয়ে থাকে, তাহলে মনে হয়, এটি এমন রাতের ঘটনা যে-রাতের কিছু অংশ কেটে যাওয়ার পর চাঁদ উদিত হয়েছিলো।

দীপ্তিমান থাকার পর এবং সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করার পর নির্ধারিত সময়ে সূর্যও ইরাকের ভূখণ্ড থেকে সরে পড়তে লাগলো। ধীরে ধীরে অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত সামনে আসতে লাগলো এবং অবেশেষে সূর্যও তাদের দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। এখন সময় এসে গেলো যে, হযরত ইবরাহিম আ. প্রকৃত তত্ত্ব ঘোষণা করে দিয়ে তাঁর সম্প্রদায়কে নিরুত্তর করে দেন। তারা যেনো ভাবতে বাধ্য হয় যে তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যদি এসব গ্রহ-নক্ষত্র রব ও মাবুদ হওয়ার অধিকারী হয়, তাহলে কী কারণে ওদের মধ্যে আমাদের চেয়েও অধিক পরিবর্তন ও অস্থায়িত্ব দেখা যায়? এবং কেনো ওরা এত তাড়াতাড়ি পরিবর্তনের ও অস্থায়িত্বের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে? যদি ওরা রব ও মাবুদ হয়ে থাকে, তবে কেনো ওরা অস্তমিত হয়? যেরূপ দীপ্তিমান ও উজ্জ্বল দেখা যাচ্ছিলো তেমন উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান থাকে না কেনো? চাঁদের আলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাগুলোর আলোকে অনুজ্জ্বল ও ম্লান করে দিলো কেনো? সূর্যের আলো চাঁদের উজ্জ্বল চেহারাকে কেনো আলোহীন করে দিলো?

সুতরাং, হে আমার সম্প্রদায়, আমি এসব শিরকমূলক আকিদা-বিশ্বাস থেকে পবিত্র এবং শিরকের উপসনার প্রতি অসন্তুষ্ট। নিঃসন্দেহে আমি আমার মনোনিবেশকে এক আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ করেছি। যিনি আকাশমণ্ডলী ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন। আমি সত্যের প্রতি একনিষ্ঠ; আমি মুশরিক নই।

এখন তার কওম বুঝতে পারলো যে, এ কী হলো। হযরত ইবরাহিম আ. আমাদের যাবতীয় অস্ত্রকে অকেজো করে দিলেন এবং আমার সমস্ত দলিল-প্রমাণকে পদদলিত করে দিলেন। এখন ইবরাহিম আ.-এর এই শক্তিশালী ও কঠিন প্রমাণকে কেমন করে খণ্ডন করি এবং তাঁর এই স্পষ্ট প্রমাণের কী উত্তর দিই। তারা এর জন্য সম্পূর্ণ অপরাগ ও অক্ষম ছিলো। যখন কোনো উপায়ই তারা খুঁজে পেলো না, তখন কিছু বলা এবং সত্যের আওয়াজকে গ্রহণ করার পরিবর্তে হযরত ইবরাহিম আ.-এর সঙ্গে বিতণ্ডা শুরু করে দিলো এবং তাদের বাতিল উপাস্যগুলোর ভয় দেখাতে শুরু করলো। বলতে লাগলো, তারা তোমার এই অপমানের প্রতিশোধ অবশ্যই গ্রহণ করবে এবং তোমাকে এর দণ্ড অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

হযরত ইবরাহিম আ. বললেন, তোমরা আমার সঙ্গে ঝগড়া করছো এবং আমাকে মূর্তিসমূহের ভয় দেখাচ্ছো, অথচ আল্লাহপাক আমাকে সত্য ও

সরল পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। আর তোমাদের কাছে পথভ্রষ্টতা ছাড়া কিছুই নেই। আমি তোমাদের মূর্তিসমূহের কোনোই পরোয়া করি না; আমার প্রতিপালক যা চাইবেন তা-ই হবে। তোমাদের মূর্তিগুলো কিছুই করতে পারবে না। এসব কথাবার্তা থেকে তোমরা কি কোনো উপদেশ গ্রহণ করো না? তোমরা তো আল্লাহর নাফরমানি করতে এবং তাঁর সঙ্গে শরিক সাব্যস্ত করতে ভয় করো না। অথচ এই শরিক সাব্যস্ত করার পক্ষে তোমাদের কাছে কোনো দলিলও নেই। আর আমার থেকে এটা আশা করো যে আমি এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে এবং পৃথিবীর নিরাপত্তার যিম্মাদার হয়ে তোমাদের মূর্তিগুলোকে ভয় করবো। আহা! কতই না ভালো হতো যদি তোমরা বুঝতে পারতে যে, কে ফাসাদ সৃষ্টিকারী আর কে সংশোধনকারী। সে-ব্যক্তিই সঠিক নিরাপত্তার জীবন লাভ করেছে যে-ব্যক্তি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং শিরক থেকে পবিত্র থাকে। সে-ব্যক্তিই সৎপথপ্রাপ্ত হয়েছে।

যাইহোক। এটি আল্লাহ তাআলার এক মহান সুদৃঢ় প্রমাণ, যা তিনি মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে হেদায়েত ও তাবলিগের পর গ্রহ-নক্ষত্রের পূজার খণ্ডনে হযরত ইবরাহিম আ.-এর মুখে প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর সম্প্রদায়ের মোকাবিলায় উজ্জ্বল দলিল ও প্রমাণের সঙ্গে তাঁর মস্তক উঁচু করে দিয়েছেন। এ-প্রসঙ্গে সুরা আন'আমের নিম্নবর্ণিত আয়াতগুলো ন্যায়ানুগ সাক্ষ্য—

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ () فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ () فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ () فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ () إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ () وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ () وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ () الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ () وَتِلْكَ

حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

(سورة الأنعام)

'এইভাবে আমি ইবরাহিমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন-ব্যবস্থা[৯] দেখাই, যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। এরপর (দেখো,) রাতের অন্ধকার তখন তাকে আচ্ছন্ন করলো তখন সে (আকাশের একটি) নক্ষত্র (দীপ্তিমান) দেখে বললো, (তোমাদের মতানুসারে) "ইহাই আমার প্রতিপালক।" (কেননা, সবাই এর পূজা করে থাকে।) এরপর যখন তা অস্তমিত হলো তখন সে বললো, "যা অস্তমিত হয় (অর্থাৎ যা উদিত হয় ও অস্তমিত হয়) তা আমি পছন্দ করি না।" এরপর যখন সে চন্দ্রকে সমুজ্জ্বলরূপে উদিত হতে দেখলো তখন বললো, "ইহা আমার প্রতিপালক।" যখন ইহাও অস্তমিত হলো তখন বললো, "আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথপ্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হবো।" এরপর যখন সে সূর্যকে (সর্বাপেক্ষা অধিক) দীপ্তিমানরূপে উদিত হতে দেখলো তখন বললো, "ইহা আমার প্রতিপালক, এটি সবচেয়ে বড়।"[১০] যখন ইহাও অস্তমিত হলো, তখন সে বললো, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যাকে আল্লাহর[১১] শরিক করো তার সঙ্গে আমার কোনো সংশ্রব নেই। (আমি সেগুলোর প্রতি অসন্তুষ্ট) আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি (কারো দ্বারা সৃষ্ট নন, বরং তিনিই) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন (এবং যাঁর আদেশ অনুযায়ী আসমান-জমিন ও সমস্ত সৃষ্ট বস্তুসমূহ চলছে) এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।" (এরপর) তার সম্প্রদায় তার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হলো। সে বললো, "তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হবে? তিনি তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। আমার প্রতিপালক অন্যকিছু ইচ্ছা না করলে তোমরা যাকে তাঁর শরিক করো তাকে আমি ভয় করি না, (আল্লাহ যদি আমার কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছা করেন তবে সেই ক্ষতি রোধ করার সাধ্য কারো নেই।) সবকিছুই আমার

---

[৯] অর্থাৎ স্রষ্টা, মালিক, প্রতিপালক ও সংরক্ষক হিসেবে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা এবং সুষ্ঠু ও সুবিন্যস্ত পরিচালন-ব্যবস্থা।

[১০] এ-সকল জ্যোতিষ্ক আল্লাহর সৃষ্ট ও তাঁর নির্দেশ মোতাবেক কাজ করে। এরা আল্লাহর আজ্ঞাবহ, এরা আল্লাহর শরিক হতে পারে না। ইবরাহিম আ. শিরক খণ্ডনের উদ্দেশ্যে এই জাতীয় প্রমাণ উপস্থাপিত করেছিলেন।

[১১] এখানে 'আল্লাহ' শব্দটি উহ্য রয়েছে।

প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত, তবে কি তোমরা অনুধাবন করবে না? তোমরা যাকে আল্লাহর শরিক করো তাকে আমি কীভাবে ভয় করবো? অথচ তোমরা আল্লাহর শরিক করতে ভয় করো না, যে-বিষয়ে তিনি তোমাদের কোনো সনদ দেন নি। সুতরাং যদি তোমরা জানো তবে বলো, দুই দলের মধ্যে কোন দল নিরাপত্তা লাভের অধিক হকদার।" যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা[১২] কলুষিত করে নি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারা সৎপথপ্রাপ্ত। আর ইহা আমার যুক্তি-প্রমাণ যা ইবরাহিমকে দিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের মোকাবিলায়; যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় আমি উন্নীত করি। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়; সর্বজ্ঞ।'
[সুরা আন'আম : আয়াত ৭৫-৮৩]

আয়াতগুলোর তাফসিরে মীমাংসাকারী উক্তি

এ-কথার ওপর সবারই ঐকমত্য রয়েছে যে হযরত ইবরাহিম আ. কখনো গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা করেন নি এবং তাঁর গোটা জীবন শিরকের অপবিত্র স্পর্শ থেকে পবিত্র। তারপরও সুরা আন'আমের উপরিউক্ত আয়ায়গুলোর তাফসিরে উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মত রয়েছে। এই আয়াতগুলোর সূচনায় যা-কিছু লেখা হয়েছে, তা সেই মতগুলোর মধ্যে অন্যতম মত অনুযায়ী লেখা হয়েছে। তার সারমর্ম এই যে, হযরত ইবরাহিম আ.-এর কথাগুলো ছিলো কওমের নক্ষত্রপূজার খণ্ডন সম্পর্কে এবং তাদেরকে নিরুত্তর করে দেয়ার জন্য। কেননা, দুটি দল যখন কোনো বিষয়ে মতভেদ করে থাকে, তখন সত্যকে প্রমাণিত করার জন্য বিতর্কসুলভ দলিল-প্রমাণের মধ্যে এক প্রকার দলিল এমনও আছে যেখানে নিজেদের দাবি প্রমাণে কেবল থিওরিসমূহই পেশ করা হয় না; বরং চাক্ষুষ দর্শনের এমন একটি পথ বেছে নেয়া হয় যাতে বিরুদ্ধ পক্ষ সেই দাবির মোকাবিলায় সম্পূর্ণ নিরুত্তর হয়ে যায়। তাদের সামনে প্রথম পক্ষের প্রমাণ খণ্ডনের সব পথ বন্ধ হয়ে যায়। এখন যদি বিরুদ্ধ পক্ষের মধ্যে হঠকারিতা না থাকে; বরং সত্যপথ অবলম্বনের স্পৃহা তাদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে, অর্থাৎ তাদের অন্তরে সত্যকে গ্রহণ করে নেয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তারা তা কবুল করে নেয়। অন্যথায় বিনা-কারণেই তারা

---

[১২] এখানে জুলুমের অর্থ শিরক। যেমন লুকমান তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে বলেছেন, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (নিশ্চয় শিরক করা বড় জুলুম।—সুরা লুকমান)

ঝগড়ায় লিপ্ত হতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এইভাবে তখন হক ও বালিতের মধ্যে পার্থক্য ফুটে ওঠে এবং প্রকৃত বিষয় ছেঁকে পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

হযরত ইবরাহিম আ. অতি উচ্চ মর্যাদাবান একজন নবী। তাঁর মিশন তর্কশাস্ত্রের নিয়ম-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো না; বরং প্রকৃত সত্যকে প্রাকৃতিক প্রমাণসমূহের সরলতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে দেয়াই ছিলো তাঁর বৈশিষ্ট্য। সুতরাং তিনি এ-পথই অবলম্বন করলেন এবং তাঁর সম্প্রদায়ের সামনে পরিষ্কার করে দিলেন যে, গ্রহ-নক্ষত্র, চাই তা সূর্য হোক বা চন্দ্র হোক, রব ও মাবুদ হওয়ার যোগ্য নয়; বরং রব ও মাবুদ হওয়া তাঁরই জন্য শোভনীয় হয় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং জমিন ও আসমানের অর্থাৎ নিম্নজগৎ ও উর্ধ্বজগতের সমুদয় সৃষ্টির স্রষ্টা ও মালিক। তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে এই উজ্জ্বল প্রমাণের কোনো জবাব ছিলো না। তাই তারা বিরক্ত হয়ে সত্য বিষয়কে কবুল করার পরিবর্তে বিতণ্ডা ও লড়াই করতে প্রস্তুত হয়ে গেলো। কিন্তু তাদের অন্তর এ-কথা মানতে বাধ্য হলো যে হযরত ইবরাহিম আ. যা-কিছু বলেছেন তা সত্য। তাদের কাছে এর কোনো সঠিক জবাব নেই। হযরত ইবরাহিম আ.-এর উদ্দেশ্য ছিলো এটাই এবং তাঁর কর্তব্যপালনের সীমাও ছিলো এ-পর্যন্ত ই। কেননা, হৃদয় চিরে সত্যকে তার ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া তাঁর সাধ্যের বাইরে ছিলো।

এই তাফসির অনুযায়ী কুরআন মাজিদের এই আয়াতগুলোর কোনো ব্যাখ্যারই প্রয়োজন হয় না এবং কোনো উহ্য বাক্যও মেনে নিতে হয় না। তা ছাড়া গ্রহ-নক্ষত্রের চাক্ষুষ দর্শন সম্পর্কে আয়াতগুলোর পূর্বাপর কথা সহজেই এই তাফসিরের সমর্থন করছে। যেমন, এই বিষয়-সম্পর্কিত পূর্বের দুটি আয়াত—

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ () وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ

(سورة الأنعام)

'স্মরণ করো, (সেই সময়ের কথা, যখন) ইবরাহিম তার পিতা আযারকে বলেছিলো, "আপনি কি মূর্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেন? আমি আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।" আর এইভাবে আমি ইবরাহিমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালনা-

ব্যবস্থা[১৩] দেখাই, (চাক্ষুষ দর্শন করিয়ে দিয়েছি) যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। [সুরা আন'আম : আয়াত ৭৪-৭৫]

এই আয়াত দুটি থেকে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ পাচ্ছে :

১। গ্রহ ও নক্ষত্র দর্শনের ব্যাপারটি হযরত ইবরাহিম আ.-এর সঙ্গে এমন সময় ঘটেছিলো যখন তিনি সত্যপ্রচার সম্পর্কে তাঁর পিতা ও কওমের সঙ্গে লিপ্ত ছিলেন। কেননা, এখানে প্রথম আয়াতের পর দ্বিতীয় আয়াতকে 'আর এইভাবে' দিয়ে শুরু করার দ্বারা এটাই বোঝা যায়। আর তৃতীয় আয়াতের শুরুতে 'অতঃপর যখন' কথায় অতঃপর শব্দটি প্রকাশ করে যে এটি দ্বিতীয় আয়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং এভাবে এই তিনটি আয়াতই একে অন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

২। আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহিম আ.-কে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে উজ্জ্বল প্রমাণ দান করেছিলেন, যেনো তিনি পিতা আযার ও তাঁর সম্প্রদায়কে নিরুত্তর করে দিতে পারে এবং সত্যের পথ দেখান। একইভাবে তিনি গ্রহ-নক্ষত্রের পূজার বিরুদ্ধেও হযরত ইবরাহিম আ.-কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব ও পরিচালন-ব্যবস্থা চাক্ষুষ দেখিয়ে দিয়েছেন, যেনো তিনি সমুদয় সৃষ্টির তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়ে যান এবং দিব্যস্তরের জ্ঞান লাভ করেন। এরপর তিনি গ্রহ-নক্ষত্রের পূজার বিরুদ্ধেও উৎকৃষ্ট প্রমাণ পেশ করতে পারবেন এবং এই বিষয়েও কওমকে সত্যপথ দেখিয়ে তাদের এই ভুলপন্থা সম্পর্কে তাদেরকে নিরুত্তর করে দিতে পারবেন। এই তো ছিলো 'দেখিয়ে দেয়া'র আয়াতটির পূর্ববর্তী অবস্থা। এখন আমরা পরবর্তী অবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করতে পারি।

অবশেষে যখন হযরত ইবরাহিম আ. সূর্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং সেটাও পরে দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে যেতে শুরু করলো, তখন এই আয়াতেরই একটি বাক্যে তাঁর বক্তব্য দেখা যায়—

قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (سورة الأنعام)

'সে (ইবরাহিম আ.) বললো, "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যাকে আল্লাহর[১৪] শরিক করো তার সঙ্গে আমার কোনো সংশ্রব নেই।'

আর এরই সঙ্গে এ-আয়াতটিও উল্লিখিত রয়েছে—

---

[১৩] অর্থাৎ স্রষ্টা, মালিক, প্রতিপালক ও সংরক্ষক হিসেবে আল্লাহর অসীম ক্ষমতা এবং সুষ্ঠু ও সুবিন্যস্ত পরিচালন-ব্যবস্থা।

[১৪] এখানে 'আল্লাহ' শব্দটি উহ্য রয়েছে।

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (سورة الأنعام)

"আমি (বাতিল উপাস্যগুলো থেকে বিমুখ হয়ে) একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন (সেগুলোর মালিক) এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।" [সূরা আন'আম : আয়াত ৭৯]

এরপর এরই সঙ্গে সংলগ্ন আয়াতটিতে রয়েছে—

وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ

'তার (ইবরাহিমের) সম্প্রদায় তার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হলো। সে বললো, "তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হবে?"'

আর সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে—

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (سورة الأنعام)

'আর ইহা আমার যুক্তি-প্রমাণ যা ইবরাহিমকে দিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের মোকাবিলায়; যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় আমি উন্নীত করি। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়; সর্বজ্ঞ।' [সূরা আন'আম : আয়াত ৮৩]

এই আয়াতগুলো থেকে যেসব ফল বের হয় তা নিম্নরূপ :

১। গ্রহ-নক্ষত্র দর্শনের বিষয়টি অবশ্যই সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলো। তাই তৃতীয় দফায় ইবরাহিম আ. নিজেকে সম্বোধন করার পরিবর্তে তৎক্ষণাৎ তাঁর কওমকে সম্বোধন করতে শুরু করে দিলেন।

২। আর তাঁর সম্প্রদায়ও সবকিছু শুনে প্রমাণের জবাব প্রমাণ দিয়ে দেয়ার পরিবর্তে ঝগড়া-বিবাদ করতে শুরু করে দিলো।

৩। সম্প্রদায়ের সঙ্গে হযরত ইবরাহিম আ.-এর এই কথোপকথন অর্থাৎ প্রমাণ প্রদানকে আল্লাহপাক নিজের পক্ষ থেকে প্রমাণ প্রদান বলে সাব্যস্ত করেছিলেন। ইবরাহিম আ.-এর রিসালাতের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে এবং বহু উঁচু স্তরের। সুতরাং কওম তাঁর পথ প্রদর্শনের একান্ত মুখাপেক্ষী।

আর এসব বিষয় ছাড়া এ-কথাও প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহিম আ. সম্পর্কে এই বলেছেন—

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (سورة الأنبياء)

'আমি তো এর পূর্বে ইবরাহিমকে সৎপথের জ্ঞান দান করেছিলাম এবং আমি তার সম্পর্কে ছিলাম সম্যক অবগত।' [সুরা আম্বিয়া : আয়াত ৫১]

সুতরাং এ-ব্যাপারটি হযরত ইবরাহিম আ.-এর বাল্যকালের ঘটনাও হতে পারে না এবং তাঁর নিজের ঈমান ও আকিদার ব্যাপারও হতে পারে না। এখানকার বিস্তারিত বিবরণ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, আমার বর্ণিত তাফসিরই আয়াতগুলোর বিশুদ্ধ তাফসির। আর নিঃসন্দেহে এটি হযরত ইবরাহিম আ.-এর পক্ষ থেকে তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রমাণ ছিলো। এ-বিষয়ে যে, সম্প্রদায়ের লোকদের গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা করা, তাদের জন্য মন্দির নির্মাণ করা, উক্ত গ্রহ-নক্ষত্রের নাম অনুসারে নিজেদের নিম্নজগতের দেব-দেবীদের নাম রাখা ইত্যাদি। মোটকথা, ওগুলোকে রব, মাবুদ ও খোদা মনে করা নিশ্চিতরূপে বাতিল ও পথভ্রষ্টতা। কেননা, এসব গ্রহ-নক্ষত্র সবাই এক বিশেষ শৃঙ্খলে জড়িত এবং তারা দিবস ও রজনীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার পরিবর্তন গ্রহণ করে। এই পূর্ণ শৃঙ্খলার মালিক এবং স্রষ্টা শুধু সেই মহান শক্তিমান সত্তা, যাঁর কুদরত এ-সমুদয় বস্তুকে বশীভূত করে রেখেছে এবং তিনি 'আল্লাহ'। আল্লাহর কুদরকের বশীভূত থাকার ফলে—

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (سورة يس)

'সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেক্যে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। [সুরা ইয়াসিন : আয়াত ৪০]

মোটকথা, এসব উজ্জ্বল প্রমাণ ও অকাট্য দলিলের পরও যখন তাঁর সম্প্রদায় ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করলো না; মূর্তিপূজা ও গ্রহ-নক্ষত্রের পূজায় পূর্বের মতোই নিরত থাকলো, তখন হযরত ইবরাহিম আ. একদিন সর্বসাধারণের সামনে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্পর্কে এমন এক কৌশল অবলম্বন করবো যা তোমাদেরকে উত্ত্যক্ত করেই ছাড়বে। তিনি শপথ করলেন—

وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (سورة الأنبياء)

'শপথ আল্লাহর, তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্পর্কে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করবো।'[১৫] [সুরা আম্বিয়া : আয়াত ৫৭]

এ-ব্যাপারটি অর্থাৎ জনসাধারণকে যাবতীয় দিক থেকে মূর্তিপূজার দোষ প্রকাশ করে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করলেন এবং সর্বপ্রকার নসিহত ও উপদেশের মাধ্যমে তাদেরকে এ-কথা বিশ্বাস করাতে পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করলেন যে, এসব মূর্তি কোনো উপকারও করতে পারে এবং ক্ষতিও না। তোমাদের গণকেরা ও নেতারা এদের সম্পর্কে তোমাদের মনে অমূলক ভয় সৃষ্টি করে দিয়েছে যে যদি এদেরকে অবিশ্বাস করো, তবে এরা রাগান্বিত হয়ে তোমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে। কিন্তু এরা তো নিজেদের সামনে বিপদ উপস্থিত হলে সেটাও প্রতিহত করতে সক্ষম নয়, তাহলে এরা তোমাদের ক্ষতি করবে কীভাবে? কিন্তু আযার ও কওমের অন্তরসমূহে এর কোনো ক্রিয়াই হলো না। তারা তাদের দেবতাদের খোদায়ি শক্তি-সম্পর্কিত বিশ্বাস থেকে কোনোক্রমেই বিরত থাকলো না এবং হযরত ইবরাহিম আ.-এর আহ্বান ও উপদেশের প্রতি কর্ণপাত করতে কঠোরভাবে বারণ করে দিলো। তখন হযরত ইবরাহিম আ. ভাবলেন, এখন আমাকে হেদায়েত ও নসিহতের এমন পন্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে জনসাধারণ নিজেদের চোখে দেখতে পায় যে, বাস্তবিকই তাদের দেবতাসমূহ কেবল কাঠ ও পাথরের মূর্তি ছাড়া কিছুই নয়; সেগুলো বোবাও, বধিরও, অন্ধও। আর তাদের অন্তরে এই ধারণা যেনো দৃঢ়মূল হয়ে যায় যে, এ-পর্যন্ত তাদের গণক (মোহন্ত) ও নেতারা দেবতাদের সম্পর্কে যা-কিছু বলতো, সম্পূর্ণই ভুল এবং ভিত্তিহীন আর ইবরাহিমের কথাই সত্য।

তিনি ভাবলেন, যদি এমন কোনো ব্যবস্থা হয়ে যায়, তাহলে আমার সত্যপ্রচারের জন্য সহজ পন্থা আবিষ্কৃত হয়ে যাবে। এই ভেবে তিনি একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করলেন; কিন্তু সে-কথা কারো কাছে প্রকাশ করলেন না। পরিকল্পনামাফিক কাজটি তিনি এভাবে শুরু করলেন যে, কথাপ্রসঙ্গে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে এ-কথা বলে ফেললেন, "আমি তোমাদের দেবতাদের সঙ্গে এক গোপন কৌশল অবলম্বন করবো।" যেনো এই উপায়ে তাদেরকে এ-কথা জানিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য ছিলো যে, যদি তোমাদের দেবতাদের মধ্যে কোনো ক্ষমতা থাকে, যেমন

[১৫] হযরত ইবরাহিম আ. কথাগুলো স্বগত বলেছিলেন অথবা অতি ক্ষীণস্বরে বলেছিলেন।

তোমরা দাবি করে থাকো, তবে তারা আমার কৌশলকে বাতিল এবং আমাকে অক্ষম করে দিক, যাতে এমন কাজ করতে না পারি। কিন্তু তাঁর কথা যেহেতু পরিষ্কার ছিলো না, কাজেই সম্প্রদায়ের লোকেরা এদিকে কোনো মনোযোগই দিলো না। একটি সুর্বণ সুযোগ পাওয়া গেলো। কিছুদিন পরেই তাঁর কওমের একটি ধর্মীয় মেলা অনুষ্ঠিত হলো। সবাই সেই মেলায় যেতে লাগলো। তখন কিছু লোক এসে হযরত ইবরাহিম আ.-কেও মেলায় যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে শুরু করলো। হযরত ইবরাহিম আ. প্রথমে অস্বীকার করলেন। ওই লোকেরা যখন খুব বেশি চাপাচাপি করতে শুরু করলো, তখন তিনি নক্ষত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, "আজ আমি কিছুটা অসুস্থ বোধ করছি।" হযরত ইবরাহিম আ.-এর সম্প্রদায় নক্ষত্রপূজক হওয়ার কারণে নক্ষত্রসমূহের শক্তি ও ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলো। সুতরাং নিজেদের ভক্তি ও বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তারা মনে করলো, ইবরাহিম আ. আজ কোনো অশুভ নক্ষত্রের অশুভ ক্রিয়ায় আক্রান্ত রয়েছেন। এই ভেবে তারা তাঁর অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ জিজ্ঞেস না করেই ইবরাহিম আ.-কে শহরে রেখেই মেলায় চলে গেলো।

কুরআন মাজিদে এই ঘটনা নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে—

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ () فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ () فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ

'এরপর সে (হযরত ইবরাহিম আ.) তারকারাজির দিকে একবার তাকালো এবং বললো, "আমি অসুস্থ।" সুতরাং তারা তাকে পেছনে রেখে (তাকে ছেড়ে) চলে গেলো।' [সুরা আস-সাফফাত : আয়াত ৮৮-৯০]

যখন গোটা সম্প্রদায়, বাদশা, মোহন্ত এবং ধর্মীয় নেতারা সবাই মেলায় মাস্তিতে মত্ত এবং শরাব ও কাবাবে মশগুল, ইবরাহিম আ. ভাবলেন এখন উপযুক্ত সময় এসে গেছে। এখন আমি আমার পরিকল্পিত কর্ম সম্পন্ন করে ফেলি আর চাক্ষুষ দর্শনের আকারে সর্বসাধারণের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিই যে তাদের দেবতাদের সরূপ ও বাস্তবতা কী। তিনি উঠলেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করে দেখলেন ওখানে দেবতাদের সামনে নানা প্রকারের মিষ্টি, ফল, মেওয়া, হালুয়া উৎসর্গ করে রাখা হয়েছে। হযরত ইবরাহিম আ. বিদ্রূপের সঙ্গে চুপি চুপি সেই মূর্তিসমূহকে সম্বোধন করে বললেন, এসব সুস্বাদু খাদ্য বিদ্যমান, এগুলো খাচ্ছো না কেনো? এরপর বললেন, আমি কথা বলছি, কী হলো, তোমরা আমার কথার জবাব দিচ্ছো না কেনো? তারপর তিনি সবগুলো

মূর্তিকে ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেললেন এবং হাতের কুঠারটি সবচেয়ে বড় মূর্তিটির কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে রেখে চলে গেলেন।

এই ঘটনা কুরআন মাজিদ বিবৃত হয়েছে এভাবে—

فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ () مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ () فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ (سورة الصافات)

'পরে সে সন্তর্পণে তাদের দেবতাগুলোর কাছে গেলো এবং বললো, (তোমাদের সামনে স্তরে স্তরে সাজানো এসব সুস্বাদু খাদ্যদ্রব রয়েছে। তা)"তোমরা খাদ্য গ্রহণ করছো না কেনো? তোমাদের কী হয়েছে যে তোমরা কথা বলো না?" এরপর সে তাদের ওপর সবলে আঘাত হানলো।' [সূরা আস-সাফফাত : আয়াত ৯১-৯৩]

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (سورة الأنبياء)

'এরপর সে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলো মূর্তিগুলোকে, তাদের প্রধানটি ব্যতীত; যাতে তারা (মূর্তিপূজকরা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী) তার দিকে ফিরে আসে।' (এবং জিজ্ঞেস করে, এটা কী হয়ে গেলো?) [সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৫৮]

সম্প্রদায়ের লোকেরা মেলা থেকে ফিরে এসে মন্দিরে দেবতাদের এই অবস্থা দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো এবং বলাবলি করতে লাগলো, কী হলো, কে করলো এমন কাজ? এদের মধ্যে ওই ব্যক্তিও ছিলো যার সামনে হযরত ইবরাহিম আ. শপথ করে বলেছিলেন, "আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর সঙ্গে এক গোপন কৌশল অবলম্বন করবো।" সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, এ তো ইবরাহিম নামক যুবকের কাজ। সে-ই আমাদের দেবতাদের শত্রু। কুরআন মাজিদে এ-কথাটি ব্যক্ত করা হয়েছে এভাবে—

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ () قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ (سورة الأنبياء)

'তারা বললো, "আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি এরূপ করলো কে? সে নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারী।" কেউ কেউ বললো, "এক যুবককে (নিন্দার সঙ্গে) তাদের সমালোচনা করতে শুনেছি; তাকে বলা হয় ইবরাহিম।"' (অর্থাৎ, এটা তারই কাজ।) [সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৫৯-৬০]

মূর্তিগুলোর মোহন্ত এবং নেতারা এসব কথা শুনে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বলতে লাগলো, ওকে জনতার সামনে নিয়ে আসো। সবাই দেখুক অপরাধী কোন ব্যক্তি।

ইবরাহিম আ.-কে জনতার সামনে নিয়ে আসা হলো। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তারা জিজ্ঞেস করলো, হে ইবরাহিম, আমাদের দেবতাগুলোর সঙ্গে তুমি এসব আচরণ কেনো করলে? এ-মর্মে কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে—

قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ () قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ (سورة الأنبياء)

'তারা বললো, "ওকে উপস্থিত করো জনতার সামনে, যাতে তারা প্রত্যক্ষ করতে পারে।" (ইবরাহিমকে জনতার সামনে উপস্থিত করার পর) তারা বললো, "হে ইবরাহিম, তুমিই কি আমাদের উপাস্যগুলোর সঙ্গে এরূপ করেছো?" [সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৬১-৬২]

ইবরাহিম আ. দেখলেন সেই সুযোগটি তাঁর সামনে এসে পড়েছে যার জন্য তিনি এই উপায়টি অবলম্বন করেছিলেন। জনসমাবেশ বিদ্যমান, সাধারণ লোকেরা দেখতে পাচ্ছে যে তাদের দেবতাগুলোর কী দুর্দশা ঘটেছে। সুতরাং, মোহন্ত ও নেতৃবৃন্দকে জনসাধারণের সামনে তাদের বাতিল আকিদার জন্য লজ্জিত করে দেয়ার সময় এটাই, যাতে সাধারণ লোকেরা চোখ দিয়ে দেখে বুঝতে পারে যে, আজ পর্যন্ত দেবতাদের সম্পর্কে মোহন্তগণ ও নেতৃবৃন্দ তাদেরকে যা-কিছু বলেছে সবকিছুই মিথ্যা, ধোঁকা ও প্রতারণাই ছিলো। তিনি ভাবলেন, আমার এখন তাদেরকে বলা উচিত, এসব হলো বড় মূর্তিটির কাজ। তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করো। এতে তারা অবশ্যই উত্তর দেবে যে, মূর্তিও কি কথা বলতে পারে? তখনই আমার উদ্দেশ্য সফল হয়ে যাবে। তখন আমি তাদের আকিদা ও বিশ্বাসের অসারতা জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করে দেবো এবং সঠিক ও বিশুদ্ধ বিশ্বাসের শিক্ষা প্রদান করতে পারবো। আমি তাদেরকে বলে দেবো যে তারা কীভাবে বাতিল মতাদর্শ ও পথভ্রষ্টতার মধ্যে লিপ্ত রয়েছে। তখন মোহন্ত ও পূজারীদের লজ্জিত হওয়া ছাড়া আর কী করার থাকবে? তাই হযরত ইবরাহিম আ. জবাব দিলেন—

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ (سورة الأنبياء)

'সে (ইবরাহিম) বললো, "বরং এদের এই প্রধান, সে-ই তো তা করেছে, এদেরকে জিজ্ঞেস করো যদি এরা কথা বলতে পারে।" [সুরা আম্বিয়া : আয়াত ৬৩]

হযরত ইবরাহিম আ.-এর এই সুনিশ্চিত প্রমাণের বিরুদ্ধে মোহন্ত ও পূজারীদের আর কী জবাব হতে পারতো। তারা সবাই লজ্জায় নিমজ্জিত ছিলো। মনে মনে হীন ও অপমানিত হয়ে পড়েছিলো এবং ভাবছিলো যে কী জবাব দেবে। জনসাধারণও আজ সব বুঝে গেলো এবং নিজেদের চোখে সেই দৃশ্য দেখে নিলো যার জন্য তারা প্রস্তুত ছিলো না। পরিশেষে ছোট-বড় সবাইকে মনে মনে স্বীকার করতে হলো যে, ইবরাহিম আন্যায় আচরণকারী নয়; বরং অন্যায় আচরণকারী হলাম আমরা। কারণ আমরা এমন প্রমাণহীন বাতিল আকিদার ওপর বিশ্বাস রাখছি। তখন তারা অত্যন্ত লজ্জায় মস্তক অবনত করে বলতে লাগলো, হে ইবরাহিম, তুমি তো ভালো করেই জানো যে এসব দেব-দেবীর মধ্যে বাকশক্তি নেই। এরা তো নিষ্প্রাণ মূর্তিমাত্র।

এ-ঘটনাটিকে কুরআন মাজিদ ব্যক্ত করছে এভাবে—

فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ () ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ (سورة الأنبياء)

'তখন তারা মনে মনে চিন্তা করে দেখলো এবং একে অপরকে বলতে লাগলো, "তোমরাই তো সীমালঙ্ঘনকারী।" (কারণ তোমরা মূর্তিগুলোকে অরক্ষিত অবস্থায় রেখেছো।) অতঃপর (লজ্জায়) তাদের মস্তক অবনত হয়ে গেলো এবং তারা বললো,[১৬] (হে ইবরাহিম,) "তুমি তো জানোই যে এরা কথা বলে না।"' (তুমি তো ভালো করেই জানো যে এই দেবতাগুলোর বাকশক্তি নেই।) [সুরা আম্বিয়া : আয়াত ৬৪-৬৫]

এভাবে হযরত ইবরাহিম আ.-এর দলিল-প্রমাণ সফলকাম হলো এবং শত্রুরা স্বীকার করলো যে, অন্যায়াচারী এবং সীমালঙ্ঘনকারী আমরাই। এবং তাদেরকে জনসাধারণের সামনে স্বীকার করতে হলো যে, আমাদের এই দেবতাসমূহের জবাব দেয়ার ও কথা বলার শক্তি নেই। উপকার ও ক্ষতি করার শক্তি থাকা তো দূরের কথা।

তখন হযরত ইবরাহিম আ. সংক্ষিপ্ত ব্যাপকার্থক শব্দে তাদেরকে উপদেশও দিলেন এবং তিরস্কারও করলেন। তিনি তাদের বললেন, যখন

---

[১৬] 'তারা বললো' শব্দ দুটি এখানে উহ্য আছে।

তোমাদের এই দেবতারা উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না, তবে তারা কেমন করে মাবুদ ও খোদা হতে পারে? আফসোস! এতটুকু কথাও তোমরা বুঝো না? বা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগাও না? এই মর্মে কুরআন মাজিদে উল্লেখ করা হয়েছে—

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ () أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (سورة الأنبياء)

'ইবরাহিম বললো, "তবে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করো যা তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না? ধিক্ তোমাদেরকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত করো তাদেরকে! তবুও কি তোমরা বুঝবে না?" (তোমরা কি বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করো না?) [সুরা আম্বিয়া : আয়াত ৬৬-৬৭]

فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ () قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ () وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (سورة الصافات)

'তখন ওই লোকগুলো তার দিকে ছুটে এলো। (হইচই করে তাঁর চারপাশে সমবেত হলো।) সে বললো, "তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ করো, তোমরা কি তাদেরই পূজা করো? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরি করো তাকেও।"' [সুরা আস-সাফফাত : আয়াত ৯৪-৯৬]

হযরত ইবরাহিম আ.-এর দাওয়াত ও উপদেশের ফল এই হওয়া উচিত ছিলো যে, কওমের সব লোক তাদের বাতিল আকিদা থেকে তওবা করে হানিফি ধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছে এবং বক্রপথ ত্যাগ করে সিরাতুল মুস্ত াকিমের ওপর চলতে শুরু করেছে। কিন্তু তাদের অন্তরসমূহের বক্রতা, নফসের অবাধ্যতা, নাফরমানিমূলক মনোবৃত্তি এবং অভ্যন্তরীণ হীনতা ও অপবিত্রতা তাদেরকে এ-দিকে অগ্রসর হতে দিলো না; বরং এর বিপরীতে তারা সবাই হযরত ইবরাহিম আ.-এর সঙ্গে শত্রুতা ও দুশমনির আওয়াজ তুলতে শুরু করলো। একে অন্যকে বলতে লাগলো, যদি তোমরা দেবতাদের সন্তুষ্টি কামনা করো, তবে এই যুবককে তার ধৃষ্টতা ও অপরাধমূলক কাজের জন্য কঠোর শাস্তি প্রদান করো এবং জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে ফেলো। যাতে তার এই তাবলিগ ও দাওয়াতের ব্যাপারটিরই সমাপ্তি ঘটে।

বাদশাকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান এবং তার সঙ্গে বিতর্ক

তখন এ-ব্যাপারে পরামর্শ হচ্ছিলো এবং ধীরে ধীরে এসব কথা তৎকালীন বাদশার কান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলো। সেকালে ইরাকের বাদশার উপধি হতো নমরুদ। নমরুদ প্রজাবৃন্দের রাজাই শুধু হতো না; বরং নিজেকে তাদের খোদা ও মালিক মনো করতো। আর প্রজারাও অন্যান্য দেবতার মতো রাজাকেও তাদের উপাস্য ও খোদা বলে মানতো এবং তাকেও দেবতার মতোই পূজা করতো। এমনকি তার সঙ্গে দেবতাদের অধিক আদব রক্ষা করে চলতো। কেননা, বাদশা হতো জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান এবং একইসঙ্গে শাহি সিংহাসন ও রাজমুকুটেরও অধিকারী। নমরুদ ইবরাহিম আ.-এর বিষয়টি জানতে পেরে ক্রোধে অস্থির হয়ে পড়লো। সে চিন্তা করতে লাগলো, এই ব্যক্তি নবীসুলভ দাওয়াত ও তাবলিগ যদি এভাবেই চলতে থাকে তবে এই ব্যক্তি আমার খোদায়ি এবং রাজত্ব ও দেবত্বের ব্যাপারেও সব প্রজাকে বিমুখ করে ফেলবে ও বিগড়ে দেবে। এভাবে পূর্বপুরুষদের ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে আমার এই রাজত্বেরও অবসান ঘটবে। সুতরাং অঙ্কুরেই এ-ব্যাপারটিকে শেষ করে দেয়া ভালো। এই ভেবে সে নির্দেশ দিলো ইবরাহিমকে আমার দরবারে হাজির করো। ইবরাহিম আ. নমরুদের দরবারে পৌঁছলে নমরুদ তার সঙ্গে বাক্যালাপ করতে শুরু করলো। সে ইবরাহিম আ.-কে জিজ্ঞেস করলো, তুমি পূর্বপুরুষদের ধর্মের বিরোধিতা করছো কেনো? আর আমাকে খোদা মানতে তোমার অস্বীকৃতি কেনো? হযরত ইবরাহিম আ. বললেন, আমি এক আল্লাহর ইবাদত করছি। তিনি এক, তাঁর সঙ্গে আমি কাউকে শরিক মানি না। যাবতীয় সৃষ্টি এবং সমগ্র জগৎ তাঁরই সৃষ্ট। তিনিই সকলের স্রষ্টা ও মালিক। তুমিও তেমন একজন মানুষ, যেমন আমরা সবাই মানুষ। তবে তুমি কেমন করে রব বা খোদা হতে পারো? আর কীভাবে কাঠের তৈরি এই বোবা, বধির ও অন্ধ মূর্তিগুলো খোদা হতে পারে? আমি সঠিক পথের ওপরে আছি। আর তোমরা সবাই ভুল পথে রয়েছো। কাজেই আমি সত্যের প্রচার কেমন করে ত্যাগ করতে পারি? তোমাদের পূর্বপুরুষদের মনগড়া ধর্ম কেমন করে গ্রহণ করতে পারি?

নমরুদ ইবরাহিম আ.-কে জিজ্ঞেস করলো, যদি আমি ছাড়া তোমার কোনো খোদা থাকে, তাহলে তার এমন গুণ বর্ণনা করো, যে-শক্তি আমার মধ্যে নেই। ইবরাহিম আ. তখন বললেন, আমার রব সেই মহান

সত্তা, যাঁর আয়ত্তে রয়েছে মৃত্যু ও জীবন; তিনিই মৃত্যু দান করে থাকেন এবং তিনিই জীবন দান করেন। বাঁকা বুদ্ধির নমরুদ মৃত্যু ও জীবনের গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। নমরুদ বললে লাগলো, এভাবে মৃত্যু ও জীবন তো আমারও আয়ত্তাধীন রয়েছে। এই বলে তখনই এক নির্দোষ ব্যক্তিকে এনে জল্লাদকে নির্দেশ দিলো একে হত্যা করে ফেলো এবং মৃত্যুর ঘাটে নামিয়ে দাও। জল্লাদ তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করলো। তারপর জনৈক মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীকে কারাগার থেকে ডেকে এনে আদেশ করলো, যাও, আমি তোমার জীবন দান করলাম। এরপর সে ইবরাহিম আ.-কে লক্ষ করে বললো, দেখলে, আমিও কীভাবে জীবন ও মৃত্যু দান করে থাকি। তবে তোমার খোদার আর বিশেষত্ব কী থাকলো?

ইবরাহিম আ. বুঝলেন, নমরুদ হয়তো জীবন ও মৃত্যুর প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত নয়। কিংবা সে জনসাধারণ ও প্রজাবৃন্দকে ভুল বুঝাচ্ছে। যেনো তারা এই পার্থক্যটুকু বুঝতে না পারে যে, এর নাম জীবন দান করা নয়; বরং অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করার নামই জীবন দান করা। আর এভাবে হত্যা বা প্রাণদণ্ড থেকে রক্ষা করার নাম মৃত্যুর মালিক হওয়া নয়। মৃত্যুর মালিক তিনিই, যিনি মানুষের রুহকে তার দেহ থেকে বের করে তার নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসেন। এ-কারণেই অনেক শূলে-চড়া ও তরবারির আঘাতপ্রাপ্ত মানুষ জীবনপ্রাপ্ত হয়ে যায়। আর শূল ও হত্যা থেকে রক্ষিত অনেক মানুষ মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হয়। কোনো শক্তি মৃত্যুকে রোধ করতে পারে না। আর যদি মৃত্যুকে রোধ করা সম্ভব হতো, তাহলে ইবরাহিম আ.-এর সঙ্গে বিতর্ককারী নমরুদ রাজ্যের সিংহাসন অলঙ্কৃত করতে পারতো না; বরং তার বংশের প্রথম ব্যক্তিকেই আজো পর্যন্ত এই মুকুট ও সিংহাসনের অধিকারী দেখা যেতো। কিন্তু জানা নেই, ইরাকের এই রাজত্বের কত দাবিদার মাটির নিচে সমাহিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও কতজনের পালা আসবে। তবুও ইবরাহিম আ. ভাবলেন, আমি যদি জীবন-মৃত্যুর সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করি, তাহলে নমরুদের উদ্দেশ্য সফল হয়ে যাবে। সে জনসাধারণকে ভ্রান্তিতে ফেলে আসল ব্যাপারটিকে গড়বড় করে দেবে এবং এইভাবে আমার সৎ উদ্দেশ্যটি সফল হবে না। আর সত্যপ্রচার সম্পর্কে জনতার সামনে নমরুদকে নিরুত্তর করে দেয়ার সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ, আলোচনা ও সমালোচনা এবং বিতর্ক ও ঝগড়া আমার মূল উদ্দেশ্য নয়; বরং মানুষের মন ও মস্তিষ্কে এক

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস জন্মানোই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই তিনি এ-প্রমাণটি ছেড়ে দিয়ে তাকে বুঝানোর জন্য অন্য একটি উপায় অবলম্বন করলেন। তিনি এমন প্রমাণ উপস্থিত করলেন যা প্রতিটি মানুষই নিজের চোখে দেখে থাকে এবং কোনো তর্কশাস্ত্রের প্রমাণ ব্যতীত তা চাক্ষুষ দর্শন করে থাকে।

হযরত ইবরাহিম আ. বললেন, আমি সেই মহান সত্তাকে আল্লাহ বলে মানি যিনি প্রতিদিন সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন এবং পশ্চিম দিকে নিয়ে যান। তুমিও যদি সেরকম খোদা হওয়ার দাবি করো, তবে তাঁর বিপরীত সূর্যকে পশ্চিমদিক থেকে উদিত করো এবং পূর্বদিকে অস্তমিত করো। এ-কথা শুনে নমরুদ হতভম্ব ও নিরুত্তর হয়ে গেলো। এই এইভাবে হযরত ইবরাহিম আ.-এর মুখে আল্লাহপাকের প্রমাণ পূর্ণতা পেলো।

এই প্রমাণ শুনে নমরুদ কেনো হতবুদ্ধি হলো এবং কেনো তার কাছে এই প্রমাণের বিরুদ্ধে ভুল বুঝানোর অবকাশ থাকলো না? এইজন্য যে, হযরত ইবরাহিম আ.-এর প্রমাণটির সারমর্ম ছিলো : আমি এমন এক সত্তাকে আল্লাহ মানি, যাঁর সম্পর্কে আমার আকিদা হলো এই, যাবতীয় বস্তু এবং তাদের শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা একমাত্র তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি এই পরিচালন-ব্যবস্থাকে নিজের হেকমতের রীতিনীতি দ্বারা এমন বশীভূত করে দিয়েছেন যে, সৃষ্টিজগতের কোনো বস্তু নির্ধারিত সময়ের পূর্বে নিজের স্থান থেকে সরতেও পারে না এবং এদিক-সেদিকও হতে পারে না। তোমরা সেই পূর্ণ ব্যবস্থাপনার মধ্য থেকে কেবল সূর্যকেই দেখো। সূর্যের মাধ্যমে এই নিম্নজগৎ কী পরিমাণ উপকৃত হচ্ছে। এতকিছু সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তার উদয়-অস্তেরও একটি শৃঙ্খলা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। অতএব, সূর্য যদি লক্ষবারও এই শৃঙ্খলার বাইরে যেতে চায়, তবে সে এতে সক্ষম হবে না। কারণ, তার লাগাম বা নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ তাআলার কুদরতের হাতে রয়েছে। নিঃসন্দেহে তাঁর এই ক্ষমতা রয়েছে যে তিনি যা ইচ্ছা করবেই তা-ই করে ছাড়বেন। কিন্তু তিনি কেবল তা-ই করেন যা তাঁর হেকমতের চাহিদা অনুযায়ী হয়।

সুতরাং, এখন নমরুদের জন্য জবাব দেয়ার তিনটি ছুরত হতে পারতো। হয়ত সে বলতো যে, সূর্যের ওপর আমারও পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে এবং আমিই এসব শৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছি। কিন্তু এই জবাব সে দেয় নি এজন্য যে, সে নিজেও কোনো সময় এ-কথা বলতো না, এই সমুদয় বস্তু আমিই

সৃষ্টি করেছি এবং সূর্যের গতিবিধি আমার ক্ষমতার বশীভূত। সে কেবল নিজেকে নিজের প্রজাবৃন্দের খোদা ও দেবতা বলে পরিচয় দিতো, আর কিছুই নয়।

দ্বিতীয় ছুরত হতে পারতো এই যে, সে বলতো, আমি এই জগৎকে কারো সৃষ্টি বলে মানি না। আর সূর্য তো নিজেই স্বতন্ত্র দেবতা। তার ক্ষমতাধীনই তো অনেক কিছু রয়েছে। কিন্তু এ-কথাও সে বলে নি। তার কারণ হলো, যদি সে এ-কথা বলতো, তবে হযরত ইবরাহিম আ.-এর সেই জিজ্ঞাসাই সামনে এসে পড়তো, যা তিনি জনসাধারণের সামনে সূর্যের খোদা হওয়ার ব্যাপারে উত্থাপন করেছিলেন। সূর্য যদি খোদা-ই হয়ে থাকে, তবে কেনো ভক্ত ও পূজারীদের চেয়েও বেশি পরিবর্তন এবং ধ্বংসের লক্ষণসমূহ এই মাবুদ ও দেবতার মধ্যে বিদ্যমান? যিনি খোদা হবেন তাঁর সঙ্গে পরিবর্তন ও ধ্বংসের কী সম্পর্ক? আর তার ক্ষমতার মধ্য কি এটা আছে যে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বা পরে উদিত বা অস্তমিত হওয়া যায়?

জবাবের তৃতীয় ছুরত হতে পারতো এই, হযরত ইবরাহিম আ.-এর চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করে নিতো এবং সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করে দেখাতো। কিন্তু নমরুদ যেহেতু এই তিনটি ছুরতের কোনো ছুরতেই জবাব দিচ্ছিলো না, তাই হতবুদ্ধি ও নিরুত্তর হওয়া ছাড়া তার আর কোনো উপায়ই ছিলো না।[১৭]

---

[১৭] খ্রিস্টান পাদরিগণ এবং তাদের অন্ধ অনুকরণে আর্য সমাজ এখানে বর্ণিত হযরত ইবরাহিম আ.-এর বিতর্কের ওপর এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছে—'যদি নমরুদ এমন কথা বলে বসতো যে, হে ইবরাহিম, তুমিই তোমার খোদার সাহায্যে সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করে দেখাও, তাহলে ইবরাহিমের নিকট কী উত্তর ছিলো?' এ-প্রশ্নটি অত্যন্ত দুর্বল প্রশ্ন এবং তরল। কারণ আমি ইবরাহিম আ.-এর বিতর্কের যে-ব্যাখ্যা প্রদান করেছি এবং যা প্রকৃত সত্য, তার ওপর এমন প্রশ্ন সৃষ্টিই হতে পারে না। কেননা, নমরুদ জানতো যে, সে এ-ধরনের কথা বলতে পারে না। কারণ এতে প্রথমে তাকে নিজের অক্ষমতা ও অপারগতা স্বীকার করতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও মেনে নিতে হয় যে, সূর্য আমাদের দেবতাও নয়, এবং তার মধ্যে এই ক্ষমতাও নেই যে সে আমাদের এই দাবিকে ইবরাহিমের মোকাবিলায় মঞ্জুর করে নেয়। এ-কারণে সে নীরবতাকেই অগ্রাধিকার প্রদান করেছে।

আর যদি সে এমন প্রশ্ন করেই বসতো, তবে ইবরাহিম আ.-এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, আল্লাহ তাআলা নিজের সত্য নবীকে অপমানিত করবেন না। ইবরাহিম আ.-এ দোয়ায় নিঃসন্দেহে তিনি সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করে ইবরাহিম আ.-এর সত্যতা প্রকাশ করে দিতেন। এ-বিষয়টি জড়বাদীদের জন্য এই আল্লাহর কুদরতের ওপর নিয়ন্ত্রণ

নমরুদের সঙ্গে হযরত ইবরাহিম আ.-এর বিতর্কটির কথা সুরা বাকারায় সংক্ষিপ্ত আকারে কিন্তু নমনীয়ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (سورة البقرة)

'তুমি কি ওই ব্যক্তিকে দেখো নি, যে ইবরাহিমের সঙ্গে তার প্রতিপালকের সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলো, যেহেতু আল্লাহ তাঁকে কর্তৃত্ব (রাজত্ব) দিয়েছিলেন। যখন ইবরাহিম বললো, "তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান", সে বললো, "আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই।" ইবরাহিম বললো, "আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদয় করান, তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় করাও তো।" সুতরাং যে কুফরি করেছিলো (বাদশা নমরুদ) সে হতবুদ্ধি হয়ে গেলো। আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। [সুরা বাকারা : আয়াত ২৫৮]

মোটকথা, হযরত ইবরাহিম আ. সর্বপ্রথম তাঁর পিতা আযারকে ইসলাম গ্রহণের উপদেশ প্রদান করলেন। তাকে সত্যের বাণী শুনালেন এবং সরল ও সত্যপথ দেখালেন। এপর জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে আহ্বান জানালেন। আল্লাহ আদেশ মেনে নেয়ার জন্য প্রকৃতির উত্তম নিয়ম-কানুন ও প্রমাণসমূহ পেশ করলেন। কোমল ও মধুর কথা, অথচ শক্তিশালী ও উজ্জ্বল দলিল-প্রমাণের সঙ্গে সত্যকে তাদের সামনে পেশ করলেন। অবশেষে বাদশা নমরুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করলেন। বাদশার

প্রত্যাশীদের জন্য অবশ্যই বিস্ময়কর হতে পারে। কিন্তু যাঁদের আকিদা ও বিশ্বাস এই যে, সৃষ্টিজগতের এসব শৃঙ্খলা যদি নির্দিষ্ট নিয়মাবলির চাপাকলের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়, তবে এই চাপাকল ওইসব বস্তুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে নয়; বরং এই চাপাকলকে কষে বাঁধা ও দৃঢ় করা অন্য এক মহাক্ষমতাশালী সত্তার কাজ। যিনি সবার উর্ধ্বে এবং যাবতীয় পদার্থের ক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্য তাঁরই কুদরতের হাতে বিদ্যমান। অতএব, তিনি ইচ্ছা করলে যাবতীয় বস্তুর ক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যকে পরিবর্তিতও করে দিতে পারেন, ধ্বংসও করে দিতে পারেন। সেই পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতাশালী, নিরঙ্কুশ মালিক ও অধিপতির নাম 'আল্লাহ'। এমন বিশ্বাস পোষণকারীদের দৃষ্টিতে সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করার বিষয়টি বিস্ময়কর নয়।

কাছে এ-কথা স্পষ্ট করে দিলেন যে, রব ও মাবুদ হওয়ার যোগ্যতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য শোভা পায়। বিশাল থেকে বিশাল সম্রাট এবং রাজাধিরাজেরও তাঁর সমকক্ষতা ও সমতুল্যতার দাবি করার অধিকার নেই। কেননা, সে এবং সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর হাতেই সৃষ্ট এবং অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও আযার, বাদশা নমরুদ এবং দেশের সাধারণ জনমণ্ডলী হযরত ইবরাহিম আ.-এর দলিল-প্রমাণের সামনে নিরুত্তর ছিলো। মনে মনে তাঁর সত্যতা স্বীকারকারী, এমনকি মূর্তিগুলোর ব্যাপারে তো মুখেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, ইবরাহিম যা বলছে তা-ই সত্য ও সঠিক। তারপরও তাদের মধ্য থেকে কেউ সরল ও সৎপথ গ্রহণ করলো না, সত্য গ্রহণে বিরতই থাকলো।

কেবল এতটুকুই নয়, নিজেদের লজ্জা ও অপমানের প্রতিক্রিয়ায় প্রভাবিত হয়ে অত্যন্ত ক্ষোভে ও ক্রোধে জ্বলে উঠলো। রাজা থেকে প্রজারা পর্যন্ত সবাই সর্বসম্মতক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেললো যে, দেবতাদের অপমান করা এবং পূর্বপুরুষদের ধর্মের বিরোধিতা করার কর্মফল হিসেবে ইবরাহিমকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ফেলে পুড়িয়ে ফেলাই কর্তব্য। কেননা, এমন ভয়ঙ্কর অপরাধীর শাস্তি এটাই হতে পারে। আর দেবতাদের অপমানের প্রতিশোধ এভাবেই গ্রহণ করা যেতে পারে।

নমরুদের অগ্নিকুণ্ড ও তার শীতল হওয়া

এ-পর্যায়ে পৌঁছে হযরত ইবরাহিম আ.-এর চেষ্টা ও পরিশ্রমের বিষয়টি সমাপ্ত হয়ে গেলো। এখন তার সম্প্রদায় দলিল ও প্রমাণের শক্তির মোকাবিলায় জড় পদার্থের শক্তি ও ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করে দিলো। পিতা তাঁর শত্রু। সাধারণ মানুষ তাঁর বিরোধী। যুগের বাদশা তাঁর পেছনে লেগেছে। একজনমাত্র ব্যক্তি আর চারপাশে বিরোধিতার ধ্বনি, শত্রুতার চিৎকার, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণ ও ভয়ঙ্কর শাস্তি প্রদানের স্পৃহা। এ-সময় কে তাঁকে সাহায্য করবে? তাঁকে হেফাজত করার সরঞ্জাম কীভাবে প্রস্তুত হবে?

কিন্তু হযরত ইবরাহিম আ.-এর অন্তরে তার জন্য কোনো পরোয়াও ছিলো এবং সে-কারণে কোনো ভয়ও ছিলো না। তিনি আগেই মতোই নির্ভীক, নিশ্চিন্ত এবং বিদ্রূপকারীদের বিদ্রূপ থেকে বেপরোয়া এবং

আগেই মতোই সত্যপ্রচারে একনিষ্ঠ এবং সৎপথের আহ্বান ও হেদায়েতকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। অবশ্য এমন নিদারুণ সময়ে, যখন জড় পদার্থের ওপর নির্ভর নেই, পার্থিব উপকরণ বিলুপ্ত এবং হেফাজত ও সাহায্যের যাবতীয় বাহ্যিক সরঞ্জাম নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো, তখনো ইবরাহিম আ.-এর এমন একটি শক্তিশালী ও শ্রেষ্ঠ নির্ভর ছিলো, যিনি সমস্ত নির্ভরের নির্ভর এবং সমুদয় সাহায্যের সাহায্যকারী বলে অভিহিত এবং তা ছিলো একমাত্র আল্লাহর (ওপর) নির্ভর। আল্লাহপাক তাঁর উচ্চ মর্যাদাবান নবী, কওমের মহান হেদায়েতকারী এবং সত্যপথ প্রদর্শককে সহায়হীন থাকতে দিলেন না। শত্রুদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিলেন।

ঘটনা ঘটেছিলো এমন, নমরুদ এবং তার সম্প্রদায় হযরত ইবরাহিম আ.-কে শাস্তি প্রদানের জন্য একটি স্থান নির্ধারিত করলো এবং তাতে কয়েকদিন পর্যন্ত আগুন প্রজ্জ্বলিত করলো। এমনকি তার জ্বলন্ত শিখায় চারপাশের সব বস্তু ঝলসে যেতে লাগলো। এভাবে যখন বাদশা ও তার সম্প্রদায় পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে গেলো যে, এখন এই আগুন থেকে ইবরাহিমের জীবিত বের হয়ে আসার সম্ভাবনাই বাকি নেই। তখন তারা ইবরাহিম আ.-কে একটি চড়কের ওপর বসিয়ে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করলো।

তৎক্ষণাৎ আগুনের মধ্যে দহনশক্তি প্রদানকারী আগুনকে নির্দেশ দিলেন, ইবরাহিমের ওপর দহনক্রিয়া করো না; দহনশক্তিসমূহের সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও ইবরাহিমের প্রতি নিরাপত্তাময় শীতল ও স্নিগ্ধ হয়ে যাও। আগুন সঙ্গে সঙ্গে ইবরাহিম আ.-এর ওপর স্নিগ্ধ ও শান্তিময় হয়ে গেলো। শত্রুরা তার কোনো ক্ষতিই করতে পারলো না। ইবরাহিম আ. জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে সংরক্ষিত ও নিরাপদ অবস্থায় শত্রুদের ভিড়ের মধ্য দিয়ে বের হয়ে গেলেন। কবি বলেছেন—

دشمن اگر قویست نگہبان قوی ترست

"শত্রু যদিও শক্তিশালী; কিন্তু রক্ষাকারী তার চেয়েও অধিক শক্তিশালী।"

এখানে একজন ধার্মিক মানুষের মনের তৃপ্তি ও অন্তরের শান্তির জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে আগুনের শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাওয়াকে সঠিক ও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে বিশ্বাস করবে। কারণ প্রথমে সে নিজের জ্ঞান ও বিবেকের সাহায্যে এই বিষয়টি যাচাই করে নিয়েছে যে, কুরআন

মাজিদের শিক্ষা মূলত আল্লাহপাকের ওহির শিক্ষা এবং তা আনয়নকারী ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি দিক নবীসুলভ নিষ্পাপতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আর তিনি এটাও যাচাই করে নিয়েছে যে, তিনি যেসব অলৌকিক ও অস্বাভাবিক তত্ত্ব-সম্পর্কিত সংবাদ আমাদেরকে প্রদান করছেন এবং আল্লাহর ওহির মাধ্যমে আমাদেরকে শুনাচ্ছেন, তা জ্ঞানের জন্য যদিও বিস্ময়কর, কিন্তু বিবেকের দৃষ্টিতে অসম্ভব নয়। সুতরাং একজন সত্যবাদী সংবাদদাতার (যাঁর জীবনের সত্যতাকে প্রতিটি দিক থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত করে নেয়া হয়েছে) এ-জাতীয় সংবাদসমূহ সন্দেহাতীতভাবে সঠিক ও সত্য। আর রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস বলেছেন, যে-ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে মিথ্যা কথা বলেন না এবং তাদের সঙ্গে প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা করে না, সে এক নিমিষের জন্যও আল্লাহর প্রতি কোনো ভুল কথার সম্পর্ক আরোপ করতে পারে না এবং কখনো আল্লাহর প্রতি মিথ্যা বলার দুঃসাহস করতে পারে না। আর ধর্মীয় জীবনে পরিচ্ছন্ন ও সরল পথ এটাই যে, যে-ধর্মের পূর্ণ শিক্ষাকে জ্ঞান ও বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করে সবদিক থেকে নিশ্চিন্ত হওয়ার যোগ্য পাওয়া গেছে, তার বর্ণিত এমন কতগুলো বিষয়ের ওপর, যা শুধু কেবল বিবেকের কাছেই বিস্ময়কর, কিন্তু তার কাছে মূলত অসম্ভব নয়। চুলচেরা দার্শনিক তত্ত্বনুসন্ধান নয় ব্যতীতই ঈমান আনা হবে এবং ওহি আনয়নকারী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সেই সুনিশ্চিত ও সন্দেহহীন সংবাদকে সূর্যালোকের চেয়ে অধিক স্পষ্ট মনে করা হবে। কেননা, যাবতীয় বস্তুর মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়াশীলতা সৃষ্টিকারী আল্লাহর মধ্যে এই ক্ষমতাও রয়েছে যে, যখন ইচ্ছা তাদের মধ্য থেকে প্রদত্ত বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়াশীলতাকে ছিনিয়ে নিতে পারেন এবং যখন ইচ্ছা ভিন্নরকম অবস্থার সঙ্গে পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু জড়বাদীদের জন্য যদি এই পন্থা শান্তি ও তৃপ্তিজনক না হয় এবং দর্শনশাস্ত্রের উন্মাদ মতবাদ এ-বিষয়টিকেও চুলচেরা দার্শনিক তত্ত্বানুসন্ধান থেকে পবিত্র থাকতে দিতে না চায়, তারপরও তাদের জন্যও এই মুজেযাটি অস্বীকার করার কোনোই অবকাশ নেই। কেননা, আমরা মানি যে, আগুনের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য দগ্ধ করা। যে-বস্তুই তাতে পড়বে সেটিই দগ্ধ হবে। কিন্তু এটার কী কারণ যে, কিছু কাপড় ও কিছু বস্তু এমন আছে যাদেরকে ফায়ারপ্রুফ বলা হয়, আগুনের লেলিহান শিখার

মধ্যে সংরক্ষিত থাকে। আগুন তাদেরকে জ্বালিয়ে দিয়ে ছাই ও ভস্মে পরিণত করে না কেনো?

তোমরা বলবে, আগুনের মধ্যে যথারীতি দগ্ধকরণের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে; কিন্তু ওই কাপড় বা ওই বস্তুতে এমন এক প্রকারের রাসায়নিক পদার্থ লাগিয়ে দেয়া হয়েছে, যার ওপর আগুন তার কর্মক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। এমন নয় যে আগুন তার দহনশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

তবে একজন ধার্মিক মানুষের জন্য একইভাবে তোমাদের দার্শনিক মতে এমন জবাব দেয়ার অধিকার কেনো থাকবে না যে, নমরুদ ও তার সম্প্রদায়ের প্রজ্জ্বলিত আগুনে দগ্ধ করার বৈশিষ্ট্য যথারীতি আগের মতোই বহাল ছিলো; কিন্তু তা হযরত ইবরাহিম আ.-এর দেহের জন্য নিষ্ক্রিয় সাব্যস্ত হয়েছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, তোমাদের ফায়ারপ্রুফে মানুষের চিন্তাপ্রসূত চেষ্টার প্রভাব রয়েছে, এবং এ-কারণে প্রতিটি শিক্ষার্থী একটি শাস্ত্রের মতো তা শিখে নেয়ার সুযোগ লাভ করে। আর ইবরাহিম আ.-এর দেহ কোনো মাধ্যম ব্যতীত আল্লাহর হুকুমের প্রভাবে হয়েছিলো। এ-জাতীয় ঘটনা নবীর সত্যতা এবং শত্রুপক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁর প্রাধান্য প্রকাশ করার জন্য কোনো কোনো সময় বিশেষ হেকমতের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ পেয়ে থাকে। শরিয়তের পরিভাষায় এ-ধরনের ঘটনা 'মুজেযা' বলে অভিহিত হয়। নিঃসন্দেহে তা কোনো শাস্ত্র নয়; সরঞ্জাম ও উপকরণের সাহায্যে উৎপাদিত প্রক্রিয়ার মুখাপেক্ষীও নয়।

সুতরাং আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ যদি এমন শক্তির অধিকারী হতে পারে যে, কোনো বস্তুর স্বভাবসিদ্ধ বৈশিষ্ট্যকে কোনো বস্তুর ওপর ক্রিয়া করতে বারণ করে দেয়, তাহলে যাবতীয় বস্তুর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির স্রষ্টার কেনো এই শক্তি থাকবে না যে তিনি কোনো ক্ষেত্র বিশেষে বস্তুসমূহের ক্রিয়াকে কার্যকরী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করে দেন?

আর যদি আজকের বিজ্ঞানের আবিষ্কারের খোলা ময়দানে এমন গ্যাস থাকতে পারে যা দেহের ওপর ক্রিয়া করলে সেই দেহ আগুনের দহন থেকে নিরাপদ থাকে, তবে সেই গ্যাসের সৃষ্টিকর্তার জন্য কোনো বাধা আছে যে তিনি নমরুদের প্রজ্জ্বলিত আগুনের ভেতর ইবরাহিম আ. পর্যন্ত পৌছে দিয়েছেন এবং তিনি আগুনকে অনুরূপভাবে ইবরাহিম আ.-এর জন্য শীতল ও শান্তিময় করে দিয়েছেন?

হযরত ইবরাহিম আ.-এর এই মুজেযাময় ঘটনাটি কুরআন মাজিদে বিবৃত হয়েছে এভাবে—

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ () قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ () وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (سورة الأنبياء)

'তারা বললো, "ওকে পুড়িয়ে ফেলো, সাহায্য করো তোমাদের দেবতাগুলোকে, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।" আমি বললাম, "হে আগুন, তুমি ইবরাহিমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।" ওরা তার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা (চক্রান্ত) করেছিলো। কিন্তু আমি ওদেরকে করে দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।' (তারা সফলকাম হলো না।) [সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৬৮-৭০]

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ () فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ () وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (سورة الصافات)

'তারা বললো, "এর জন্য এক ইমারত[১৮] নির্মাণ করো, এরপর তাকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করো।" তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সংকল্প করেছিলো; কিন্তু আমি তাদেরকে অতিশয় হেয় (হীন ও অপদস্থ) করে দিলাম। সে (হযরত ইবরাহিম আ.) বললো, "আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম, তিনি আমাকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করবেন।" [সূরা আস-সাফফাত : আয়াত ৯৭-৯৯]

বুখারি শরিফের হাদিস

হযরত ইবরাহিম আ.-এর ঘটনাবলি প্রসঙ্গে কুরআন মাজিদ এখানে কওমের কতিপয় লোক এবং ইবরাহিম আ.-এর মধ্যে মেলায় অংশগ্রহণের জন্য যে-কথাবার্তা হচ্ছিলো তার মধ্য থেকে ইবরাহিম আ.-এর এই উক্তিটি উদ্ধৃত করেছে—তিনি বললেন, আমি অসুস্থ। আবার যখন মূর্তিগুলোকে ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁর তখনকার জবাব কুরআনে এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে—

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ (سورة الأنبياء)

---

[১৮] চারদিকে পাকা প্রাচীরযুক্ত ইমারত, যাতে আগুন প্রজ্বলিত করা হয়েছিলো।

'সে (ইবরাহিম) বললো, "বরং এদের এই প্রধান, সে-ই তো তা করেছে, এদেরকে জিজ্ঞেস করো যদি এরা কথা বলতে পারে।" [সুরা আম্বিয়া : আয়াত ৬৩]

এই দুটি বাক্য সম্পর্কে একজন নিরপেক্ষ মানুষ এক নিমিষের জন্যও এ-কথা চিন্তা করতে পারে না যে, এতে মিথ্যার লেশমাত্র থাকতে পারে। 'আমি অসুস্থ' বাক্যে অভ্যন্তরীণ অসুস্থতা ও রোগের কথা বলা হয়েছে। কেবল ইবরাহিম আ.-ই ভালো বলতে পারেন যে তা কী রোগ। এতে অপরের অযথা সন্দেহ ও ইতস্তত করার কী কারণ আছে? এমনকি, যদি বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোনো ব্যক্তিকে সুস্থ দেখা যায়, তবুও এটা জরুরি নয় যে সে বাস্তবিকই সুস্থ। এটাও হতে পারে যে, তার মেজায কোনো কারণে স্বাভাবিক অবস্থায় নেই এবং এমন কোনো পীড়নে রয়েছে যা সে নিজ থেকে প্রকাশ না করলে অপরে তা বুঝতে পারে না।

দ্বিতীয় আয়াতটির বিষয়ও একইরকম। কেননা, দুইজন বিপরীত ভাবাপন্ন ব্যক্তির মধ্যে তর্ক-বিতর্ক বেঁধে যায় এবং বাক্য-বিনিময় শুরু হয়, এ-ক্ষেত্রে একজন সাধারণ শিক্ষিত লোকও এই তথ্য অবগত আছে যে, প্রতিপক্ষকে নিজের ভুল সম্পর্কে অবহিত করা এবং তাকে নিরুত্তর করে দেয়ার উত্তম পন্থা এই যে, তার মান্য-করা আকিদাসমূহ থেকে কোনো একটি আকিদাকে সঠিক ধরে নিয়ে তার ব্যবহার এইভাবে করা যে, তার ফল প্রতিপ্রক্ষে প্রতিকূলে এবং নিজের অনুকূলে প্রকাশ পায়।

হযরত ইবরাহিম আ. এ-কাজটিই করেছিলেন। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের বিশ্বাস ছিলো তাদের দেবতারা (মূর্তিগুলো) সবকিছুই শুনতে পায় এবং তাদের উদ্দেশ্যসমূহকে সফল করে দেয়। তারা তাদের পূজারী ও ভক্তবৃন্দের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং শত্রু ও বিরোধীদের থেকে কঠিন প্রতিশোধ নিয়ে থাকে। ইবরাহিম আ. যখন সেই দেবতাগুলোকে ভেঙে-চুরে ফেললেন, বড় মূর্তিটিকে বাদ রাখলেন। অবশেষে যখন জিজ্ঞাসাবাদের সময় এলো, তিনি বিতর্কের সেই উত্তম পন্থাটি অবলম্বন করলেন। ইতোপূর্বে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। তার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, মোহন্ত, পূজাকারী ও গোটা সম্প্রদায়কে স্বীকার করতে হয়েছে, আমরাই ভুলের মধ্যে আছি, আপনিই বাস্তব তথ্য সম্পর্কে অবগত আছেন যে এদের বাক্‌শক্তি নেই।

সুতরাং এই দুটি বাক্যের মধ্যে একটি বাক্যও এমন নয়, যাকে প্রকৃতপক্ষে অথবা বাহ্যিকভাবে মিথ্যা বলা যেতে পারে। এ-দুটি কথা

তো কুরআন মাজিদে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সহিহ বুখারি শরিফে ও সহিহ মুসলিম শরিফে এবং অন্য কতিপয় হাদিসের কিতাবে উপরিউক্ত দুটি কথা ছাড়াও তৃতীয় আরো একটি কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত হাদিসটি এ-রকম শব্দে শুরু হয়েছে—

لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ

"ইবরাহিম আলাইহি সালাম তিনটি মিথ্যা ছাড়া জীবনে কখনো মিথ্যা বলেন নি..."[১৯]

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিস্তারিতভাবে সেই তিনটি কথা বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে দুটি কথা তো কুরআন মাজিদেই বর্ণিত আছে এবং তা উপরে বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় যে-কথাটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে তা এমন : হযরত ইবরাহিম আ. মিসর হয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি মিসরে পৌঁছার পূর্বেই তাঁর পবিত্র জীবনসঙ্গিনী হযরত সারা রা.-কে বললেন, মিসরের রাজা খুবই জালিম। কোনো সুন্দরী নারীকে দেখলে তাকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যায়। আর তার সঙ্গী পুরুষ তার স্বামী হলে তাকে হত্যা করে ফেলে। আর অন্যকোনো আত্মীয় হলে তার কোনো ক্ষতি করে না। তুমি যেহেতু আমার ধর্মীয় বোন এবং এই ভূখণ্ডে তুমি ও আমি ছাড়া আর কোনো মুসলমান নেই, সুতরাং তুমি রাজাকে বলো, আমার সঙ্গের এই লোক আমার ভাই। অতএব, কথা এমনই বলা হলো। রাতে সেই রাজা যখন অসৎ উদ্দেশ্যে হযরত সারা রা.-এর প্রতি হাত বাড়ালো, তৎক্ষণাৎ তার হাত অবশ হয়ে গেলো এবং সে কোনোক্রমেই তাঁর দেহ স্পর্শ করতে পারলো না। এই অবস্থা দেখে সে সারাকে বললো, তোমার খোদার কাছে দোয়া করো, যেনো আমার হাত ভালো হয়ে যায়। তাহলে আমি তোমাকে মুক্ত করে দেবো। হযরত সারা রা. দোয়া করলেন। রাজার হাত ভালো হয়ে গেলো। কিন্তু সে আবারো অসৎ সংকল্প নিয়ে এগিয়ে এলো। আবারো তার হাত অবশ হয়ে গেলো। তৃতীয়বারও অনুরূপ ঘটনা ঘটলো। তখন সে বললো, মনে হচ্ছে এই স্ত্রীলোকটি জিন, মানুষ নয়। একে তাড়াতাড়ি আমার সামনে থেকে নিয়ে যাও। রাজা হযরত হাজেরাকে তাঁর সঙ্গে দিয়ে দিলো এবং বললো, একেও তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি একে তোমার অধীন

---

[১৯] সহিহুল বুখারি : হাদিস ৩৩৫৮।

করে দিলাম। হযরত সারা রা. হাজেরাকে সঙ্গে নিয়ে হযরত ইবরাহিম আ.-এর কাছে পৌঁছলেন। ইবরাহিম আ. কী অবস্থা জানতে চাইলে হযরত সারা রা. মোবারকবাদ দিয়ে বললেন, আল্লাহ তাআলার শোকর যে তিনি ওই ফাসেক ও অসচ্চরিত্র ব্যক্তি থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন এবং আপনার জন্য একজন খাদেমা সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন। হযরত আবু হুরায়রা রা. এই হাদিসটি বর্ণনা করে বললেন, "হে উন্নত ও অভিজাত বংশের আরববাসীগণ, ইনিই সেই হাজেরা, যিনি তোমাদের সবার জননী।"

এই হাদিসটি বিভিন্নরূপে হাদিসের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে। এটি ছাড়াও সহিহ বুখারিতে আরো একটি দীর্ঘ হাদিস রয়েছে। সেটি 'শাফাআতের হাদিস' নামে অভিহিত। বুখারি শরিফের বিভিন্ন অধ্যায়ে, যথা : সুরা বাকারার তাফসির অধ্যায়ে, কিতাবুল ইস্তিরকাক ও কিতাবুত তাওহিদে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে হযরত ইবরাহিম আ.-এর যে-আলোচনা করা হয়েছে তার সারমর্ম এই :

কিয়ামতের ময়দানের যখন সমস্ত মানুষ আদম আলাইহিস সালাম, নুহ আলাইহিস সালাম ও অন্য আম্বিয়ায়ে কেরামের কাছে আল্লাহর দরবারে সুপারিশের আবেদন জানিয়ে বিফল হবে, তখন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর কাছে আবেদন জানিয়ে বলবে, আপনি খলিলুর রহমান, আল্লাহর বন্ধু, আপনি আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করে দিন, যেনো তাড়াতাড়ি আমাদের বিচার-মীমংসা হয়ে যায়। তিনি বলবেন, আমি আল্লাহ তাআলার কাছে লজ্জিত আছি। কেননা, আমি পৃথিবীতে তিনটি মিথ্যা কথা বলেছিলাম : 'আমি অসুস্থ', বরং তোমাদের বড় মূর্তিটি এই কাজ করেছে', আর নিজের স্ত্রীকে বলেছিলাম, 'আমি তোমার ভাই।'

সহিহ বুখারি ছাড়াও হাদিসটি সহিহ মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, সহিহ ইবনে খুযাইমা, মুসতাদরাকুল হাকিম, মু'জামুত তাবরানি, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, সুনানুত তিরমিযি এবং মুসনাদে আবি উওয়ানা হাদিসের কিতাবগুলোতে বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত হয়েছে।

এই রেওয়ায়েতটি হাদিসের কিতাবসমূহে মোটামুটি ও সবিস্তার বিভিন্নরকমে বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনোটিতে সংক্ষিপ্তভাবে শুধু এতটুকু উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'প্রত্যেক নবী যখন নিচের ত্রুটি-বিচ্যুতি

বর্ণনা করে আপত্তি প্রকাশ করবেন যে তিনি সুপারিশ করতে পারবেন না।' আর কোনো হাদিসে ইবরাহিম আ.-এর জবাবের মধ্যে কেবল 'তিনটি মিথ্যা'-রই উল্লেখ আছে। কোনো হাদিসে সেই 'তিনটি মিথ্যা'র বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। আর এই রেওয়াতেগুলোর কোনো কোনোটিতে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে—

ما منها كذبة إلا ماحلَ بها عن دين الله

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'হযরত ইবরাহিম আ.-এর এই তিনটি মিথ্যার মধ্যে প্রত্যেকটিই আল্লাহর দীনের হেফাজতের জন্য বলা হয়েছে।'[২০]

যাইহোক। এ-দুটি রেওয়ায়েত সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম শরিফের রেওয়ায়েত, যা রেওয়ায়েত বা বর্ণনাসংক্রান্ত সব ধরনের দুর্বলতা থেকে পবিত্র। এই রেওয়ায়েতগুলো হযরত ইবরাহিম আ.-এর মতো একজন উচ্চ মর্যাদাশীল মুজাদ্দিদে আম্বিয়ার প্রতি মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। তবে এ-রেওয়ায়েতগুলোর কোনো কোনোটিকে এ-কথা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, রাসুলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে মিথ্যার সেই সাধারণ অর্থ গ্রহণ করেন নি, যা চরিত্র-বিষয়ক কথাবার্তায় নিতান্ত মন্দ ও কবিরা গুনাহের মধ্যে গণ্য। বরং তিনি তার বিপরীতে এ-কথা বলে দিয়েছেন যে, ইবরাহিম আ. এ-তিনটি কথাই নিজের কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থেও বলেন নি এবং কোনো পার্থিব কাজের সুবিধার প্রেক্ষিতেও বলেন নি; বরং সত্যের শত্রুদের মোকাবিলায় নিছক আল্লাহর দীনের হেফাজতের জন্য বলেছেন। তা সত্ত্বেও যে-বিষয়টি মনে খটকা লাগাচ্ছে এবং মনের ওপর গুরুভার বোঝারূপে অনুভূত হচ্ছে তা হলো উপরিউক্ত হাদিসের বর্ণনা।

মেনে নিলাম, কোনো কোনো হাদিসের বর্ণনা এখানে 'মিথ্যা' শব্দটিকে তার সাধারণ অর্থ থেকে পৃথক করে দিয়েছে। তারপরও বিষয় এই যে, প্রথমত, সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম শরিফের রেওয়ায়েতে এই অতিরিক্ত কথাগুলো উল্লেখ করা হয় নি, যদিও তা অন্য হাদিসের কিতাবে সহিহ রেওয়ায়েতে বিদ্যমান রয়েছে। দ্বিতীয়ত, কথার সত্যতা

---

[২০] جامع الأصول في أحاديث الرسول : ৮০১৮।

আম্বিয়ায়ে কেরামের (আলাইহিমুস সালাম) অবিচ্ছেদ্য গুণ এবং নবীসুলভ নিষ্পাপতার প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য। তা ছাড়া কুরআন মাজিদ বিশেষভাবে হযরত ইবরাহিম আ.-এর আলোচনা প্রসঙ্গে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে। সুতরাং বাহ্যিকভাবেও তাঁর প্রতি মিথ্যার সম্পর্ক কেমন করে হতে পারে? কুরআনে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে—

১।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (سورة مريم)

'স্মরণ করো, এই কিতাবে উল্লিখিত ইবরাহিমের কথা; সে ছিলো সত্যনিষ্ঠ, নবী।' [সুরা মারইয়াম : আয়াত ৪১]

'সিদ্দিক' শব্দটি আধিক্যজ্ঞাপক রূপ; এ-শব্দটি কেবল এমন মানুষের জন্যই প্রয়োগ করা হয় সততা ও সত্যতা যার ব্যক্তিগত ও আত্মগত গুণ।

২।

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ () شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (سورة النحل)

'ইবরাহিম ছিলো এক 'উম্মত',[২১] আল্লাহ অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না; সে ছিলো আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ; আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে পরিচালিত (হেদায়েত) করেছিলেন সরল পথে।' [সুরা আন-নাহল : আয়াত ১২০-১২১]

'মনোনীত' ও 'হেদায়েত' এমন বৈশিষ্ট্য যার সঙ্গে মিথ্যা কোনোভাবেই মিলতে পারে না; প্রকৃতরূপেও না, বাহ্যিক আকারেও না। [সুতরাং, তিনি মিথ্যাবাদী—এ-কথা কিছুতেই বলা যেতে পারে না।]

৩।

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

'(হে মুহাম্মদ) এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহিমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করো; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না।' [সুরা আন-নাহল : আয়াত ১২৩]

---

[২১] শব্দটির অর্থ সম্প্রদায়। এখানে এর অর্থ অর্থাৎ তিনি একাই একটি জাতি ছিলেন। অর্থাৎ একটি জাতির প্রতীক ছিলেন।—ইমাম রাযি, কাশশাফ, জালালাইন ইত্যাদি।

ইনি সেই ইবরাহিম যাঁর ধর্মাদর্শের অনুসরণ করার জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর রহমতপ্রাপ্ত উম্মতদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (سورة الأنبياء)

'আমি তো এর পূর্বে ইবরাহিমকে সৎপথের জ্ঞান দান করেছিলাম এবং আমি তার সম্পর্কে ছিলাম সম্যক অবগত।' [সুরা আম্বিয়া : আয়াত ৫১]

এই আয়াতগুলো এবং এ-ধরনের আরো বহু আয়াত হযরত ইবরাহিম আ.-এর যেসব বিশেষ গুণাবলি উল্লেখ করছে এবং সে-বিষয়ে যে-অকাট্য প্রমাণসমূহ পেশ করছে, তার পরে এক নিমিষের জন্যও তাঁর মতো পবিত্র ও উচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে মিথ্যার কল্পনাও হতে পারে না। মিথ্যার সংঘটন ও কার্যে পরিণত হওয়া তো দূরের কথা। চাই কি সে-মিথ্যা প্রকৃত অর্থেই হোক বা বাহ্যিক আকারেই হোক।

আলোচ্য বিষয়

এই জায়গায় পৌঁছে আরো একবার এ-কথা বলে দেয়া জরুরি মনে হয় যে, আমাদের আলোচ্য বিষয় এই নয় যে, (নাউযুবিল্লাহ) বাস্তবিক অর্থেই হযরত ইবরাহিম আ. মিথ্যা বলেছেন। কারণ কুরআন মাজিদের অকাট্য দলিল এবং আলোচ্য রেওয়ায়েতগুলো ছাড়াও অন্যান্য হাদিসের স্পষ্ট বাক্যসমূহ ইবরাহিম আ.-কে নবী, পয়গাম্বর ও রাসুল বলে আখ্যায়িত করেছে এবং তাঁর বৈশিষ্ট্যমূলক গুণাবলি সিদ্দিক, মনোনীত, হেদায়েতকৃত, হানিফ ও আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ বলে প্রমাণ করেছে। তা ছাড়া উপরিউক্ত হাদিসেও এ-কথা বর্ণিত আছে যে, তাঁর এই কথাগুলো ছিলো আল্লাহর দীনের হেফাজতের জন্য ও শত্রুদের প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে; কোনো পর্থিব উদ্দেশ্য বা সুবিধা হাসিলের জন্য ছিলো না। সুতরাং এক মুহূর্তের জন্যও এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ বা ইতস্তত করার অবকাশ নেই যে, ইবরাহিম আ. থেকে মিথ্যা ততটুকুই দূরে রয়েছে, যেমন দিবস থেকে রাত ও আলো থেকে অন্ধকার। সন্দেহাতীতভাবে তিনি একজন নিষ্পাপ নবী এবং সর্বপ্রকার গোনাহ থেকে পবিত্র।

অবশ্য এখানে আলোচ্য বিষয় এই যে, উপরিউক্ত দুটি সহিহ হাদিসে এই তিনটি কথা সম্পর্কে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত উচ্চ মর্যাদাশীল মহান নবীর ক্ষেত্রে 'মিথ্যা' শব্দটি কেনো ব্যবহার

করলেন। অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র সত্তা ধর্ম ও ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে দূর করার কারণ, জটিলতা ও সন্দেহ সৃষ্টিকারী নয়। বিশেষত, যখন এ-তিনটি কথাই তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবেও মিথ্যা নয়, প্রকৃত অর্থে তো নয়-ই।

নিঃসন্দেহে হযরত সারা রা. হযরত ইবরাহিম আ.-এর ধর্মীয় বোন ছিলেন এবং স্ত্রী-সম্পর্কের মাধ্যমে ইসলামি ভ্রাতৃত্ব-সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় না। তা ছাড়া আল্লামা ইবনে কাসির ও অন্যান্য ইতিহাসবেত্তার বিশ্লেষণ অনুযায়ী সারা রা. হযরত ইবরাহিম আ.-এর চাচা হারানের কন্যা ছিলেন। তাই তিনি চাচাতো বোনও ছিলেন। আর অসুস্থতা বিষয়ে সন্দেহাতীতভাবে এটা বলা যায়, তাঁর মন-মানসিকতা ও মেজাযের অবস্থা অবশ্যই কিছুটা অস্বাভাবিক ছিলো, যদিও কঠিন কোনো ব্যাধি না হোক। সুতরাং তাঁর 'আমি অসুস্থ বা পীড়িত' কথা সবদিক থেকেই শুদ্ধ ও সত্য ছিলো। এর এতেও কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, বিতর্কসুলভ কথাবার্তার আকারেই শত্রুকে নিরুত্তর করে দেয়ার জন্য বলেছিলেন, বরং তাদের এই বড় মূর্তিই এই কাজ করেছে। এটি ইলম বা জ্ঞানের জগতে কোনোভাবেই মিথ্যা ছিলো না। তাহলে হাদিসসমূহে কেনো এভাবে ব্যক্ত করা হলো?

এই জিজ্ঞাসার জবাবে ইসলামের উলামায়ে কেরাম দু-ধরনের মত অবলম্বন করেছেন :

১।এই হাদিসগুলো 'খবরে ওয়াহেদ' (মাত্র একজন রাবি (বর্ণনাকারী) কর্তৃক বর্ণিত)। সুতরাং সাহসের সঙ্গে এটা বলে দেয়া দরকার যে, যদিও এই রেওয়ায়েতগুলো সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম শরিফের রেওয়ায়েত এবং এ-কারণে সেগুলো 'মশহুর' হাদিসের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে; কিন্তু রাবি এই রেওয়ায়েতগুলোতে কঠিন ভুল করেছেন। সুতরাং, কখনো এগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, একজন নবীর প্রতি মিথ্যার সম্পর্ক আরোপ করার পরিবর্তে রাবিদের ভুল স্বীকার করা অনেকগুণে উত্তম এবং বিশুদ্ধ কর্মপন্থা।

ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ আর-রাযি রহ.-এর ঝোঁক এ-মতের প্রতিই এবং এ-মতই অবলম্বন করেছেন।

২। অকাট্য ও সুনিশ্চিত আকিদা এই যে, নবী ও রাসুলের প্রতি মিথ্যার সম্পর্ক আরোপ করা কোনো অবস্থাতেই জায়েয নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে

যদি নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ হাদিসমূহে, যা 'মাশহুর' ও 'মুতাওয়াতির' হাদিসের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, এ-ধরনের কোনো সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, যা নবীর নবুওতের মর্যাদার পরিপন্থী, তবে সেই হাদিসগুলোকে বিশুদ্ধ মেনে নিয়ে সেগুলোর বিশেষ বিশেষ বাক্যগুলোর এমন ব্যাখ্যা করা উচিত যাতে মূল বিষয়টির ওপরও আঘাত না আসে এবং সহিহ ও বিশুদ্ধ হাদিসকেও অস্বীকার করা না হয়। সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম শরিফের এই হাদিসগুলো যেহেতু সর্বজন কর্তৃক গৃহীত ও আদৃত হওয়ার ফলে বিশুদ্ধতা ও প্রসিদ্ধির সেই পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যাকে 'খবরে ওয়াহেদ' বলে গণ্য করা যায় না, তাই এই হাদিসগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে না। এখানে বরং 'তিনটি মিথ্যা'যুক্ত বাক্যের এই ব্যাখ্যা করা উচিত যে, 'মিথ্যা' শব্দটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে 'এমন কথা যা কোনো বিশুদ্ধ ও পবিত্র উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে।' কিন্তু সম্বোধিত ব্যক্তি সে-কথার ওই অর্থ/উদ্দেশ্য বুঝতে পারে নি, যা আসলে বক্তা বুঝাতে চেয়েছেন। বরং সে ওই কথাগুলোর অর্থ নিজের মনের ইচ্ছা অনুসারে বুঝে নিয়েছে। আর 'মিথ্যা' শব্দের এমন অর্থ কেবল হযরত ইবরাহিম আ.-এর ঘটনার জন্য আবিষ্কার করা হয় নি; বরং অলঙ্কারশাস্ত্রের পরিভাষায় একে 'মাআরিদ' অর্থাৎ ইশারা-কেনায়ার প্রকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়েছে। বিশুদ্ধভাষী ও বাগ্মী ব্যক্তিদের কথা-বার্তায় এটা বেশ প্রচলিত আছে।

এভাবে ব্যাখ্যা করলে হাদিসগুলোকে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করারও প্রয়োজন থাকে না এবং নবীর সত্যতার বিষয়টিও যথাস্থানে বিনাদ্বিধায় ও সন্দেহাতীতভাবে সঠিক থাকে। আমাদের এ-বক্তব্যকে দৃঢ়ীকরণের জন্য বলা যায়, শাফাআতের হাদিসের এই শব্দগুলো— ما منها كذبة إلا ماحلَ بها عن دين الله / হযরত ইবরাহিম আ.-এর এই তিনটি মিথ্যার মধ্যে প্রত্যেকটিই আল্লাহর দীনের হেফাজতের জন্য বলা হয়েছিলো— আমাদের উপরিউক্ত ব্যাখ্যার সমর্থন করছে। ইসলামের অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মত এটিই। তাঁরা ইমাম রাযি ও তাঁর সমমতাবলম্বী উলামায়ে কেরামের মতকে বিশুদ্ধ ও সঠিক বলে স্বীকার করেন না।

মিসরের বিখ্যাত আলেম আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার তাঁর 'কাসাসুল আম্বিয়া' গ্রন্থে ইমাম রাযির সঙ্গে একমত হয়েছেন। তিনি মিসরের তৎকালীন উলামায়ের কেরামের অভিমতের বিরুদ্ধে (যা মূলত জমহুর

উলামায়ে কেরামের সমর্থনে নাজ্জারের মতের সমালোচনার আকারে প্রকাশ করা হয়েছে) যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। তাতে তিনি হযরত ইবরাহিম আ. ও সারা রা.-এর ঘটনাটিকে অস্বীকার করেছেন।

এই লেখকের মত

কিন্তু এ-দুটি অভিমত থেকে ভিন্ন সহজ ও পরিষ্কার পন্থা আছে। সহিহ হাদিসের প্রতি অবিশ্বাস বা অস্বীকার [প্রথম মত] এবং সেগুলোর শব্দসমূহের হালকা ও দুর্বল ব্যাখ্যা [দ্বিতীয় মত] করা ব্যতীতই বিষয়টির মীমাংসা এমনভাবে করা হবে, যাতে আসল বিষয় অর্থাৎ 'নবীর নিষ্পাপতা'র ওপর কোনো ক্রটি আসতে না পারে এবং এ-ধরনের ক্ষেত্রে সুযোগসন্ধানী অপপ্রয়োগকারীরা, নবীর হাদিস নিয়ে বিদ্রূপকারীরাও ধর্মদ্রোহিতার দুঃসাহস করতে না পারে।

এই সংক্ষিপ্ত কথাটির বিস্তারিত বিবরণ এই : 'নবীর নিষ্পাপতা' বিষয়টি নিঃসন্দেহে ধর্মের মূলনীতি এবং আকিদা-বিশ্বাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্গত; বরং দীন ও ধর্মের সত্য-প্রতিপাদনের ভিত্তি ও বুনিয়াদ এই একটি বিষয়ের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। তার কারণ হলো, কোনো কোনো অবস্থায় নবী ও রাসুলও মিথ্যার কোনো না কোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারেন, চাই তা সত্যের সহায়তার জন্যই হোক—এ-কথা স্বীকার করে নেয়ার পর তাঁর আনীত সমস্ত শিক্ষা থেকে এই পার্থক্য উঠে যাবে যে, সেগুলোর মধ্যে কোন্ অংশ তার প্রকৃত অর্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর কোন্ অংশ মিথ্যার রঙে রঞ্জিত। আর এটা যদি মেনে নেয়া হয়, তাহলে দীন আর দীন থাকে না।

এ-কারণে কুরআন মাজিদের এই অকাট্য আকিদা 'নবীর নিষ্পাপতা' নিজ স্থানে একটি সুদৃঢ় ও অবিচল আকিদা। সুতরাং যা-কিছু এই আকিদার সত্যতার ওপর দোষ আরোপের কারণ হবে, তা হয়তো নিজ থেকে প্রত্যাখ্যাত এবং অস্বীকৃত হওয়ার যোগ্য হবে অথবা নিজের বর্ণনার বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য দায়ী হবে। সুতরাং অকাট্য আকিদাকে তার নিজ স্থান থেকে সরে দাঁড়ানোর প্রয়োজন হবে না। বিরোধী বস্তুটিকেই হয় ওই আকিদার অনুরূপ হতে হবে, অন্যথায় লোপ পেতে হবে।

এমনিভাবে এ-বিষয়টিও সর্বজন স্বীকৃত যে, কুরআন মাজিদের তাফসির ও ব্যাখ্যা কেবল আরবি ভাষা বা অভিধানের মাধ্যমেই করা যেতে পারে না। বরং তার মর্মার্থ বোঝার জন্য যেমন আরবি ভাষার জ্ঞানের প্রয়োজন, তেমনি, বরং তার চেয়েও অধিক, রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীসমূহ, কার্যাবলি, অবস্থাবলি সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন এবং এটিই আল্লাহর কালামের বিশুদ্ধ তাফসির ও পরিশুদ্ধ ব্যাখ্যার বাহন।

সন্দেহাতীতভাবে এটি একটি প্রমাণিত সত্য কথা যে, কুরআন মাজিদের আহকাম, যথা : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (এবং তোমরা হজ ও ওমরা আদায় করো); وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (নামায প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত আদায় করো); فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (তোমাদের কেউ যদি রমযান মাস পায় সে যেনো সে-মাসে রোযা রাখে) প্রভৃতি আদেশগুলোতে নামায, যাকাত, হজ ও রোযার মর্মার্থ কখনো আমরা আরবি ভাষার জ্ঞান বা অভিধানের মাধ্যমে নির্দিষ্টরূপে বুঝতে পারি না। আভিধানিক অর্থের মাধ্যমে কখনো কুরআনের আহকাম বোঝা যেতে পারে না। বরং আহকামগুলোর পরিচায় জানা ও বোঝার জন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওইসব বাণী ও কার্যাবলির প্রতি মুখ ফেরাতে আমরা বাধ্য, যা এই ফরয আহকামগুলোর ব্যাখ্যা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলো বলেছেন এবং করে দেখিয়েছেন। আর এটাও সত্য নয় যে, আমরা পারস্পরিক ক্রিয়া ও কার্যকলাপের মাধ্যমে ওই ফরয কার্যগুলোর স্বরূপ জানতে পারি। কেননা, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখতে আমাদের এ-কথা মানতেই হবে যে, আমাদের পারস্পরিক কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের উৎসও শেষ অবধি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী ও কার্য পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহর রাসুলের সেসব বাণী ও কার্যকলাপকে ধর্মের অংশ বলা অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায়। আর এই স্বীকৃতি ও সম্মতি ব্যতীত

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (سورة الأحزاب)

'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসুলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।' [সুরা আহযাব : আয়াত ২১]

আয়াতটির কোনো অর্থ হয় না। কারণ এই উত্তম আদর্শ কুরআন মাজিদ বা তার আয়াত নয়; বরং সেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীসমূহ, কার্যাবলি ও অবস্থাসমূহই উত্তম আদর্শ। (যার অনুকরণে নিজের ধর্মীয় জীবন গড়ে তুলতে হবে।) আর যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী, কার্য ও অবস্থাবলি ধর্মের অংশ বলে সাব্যস্ত হলো, তখন সেগুলোর সংরক্ষণের এমন উপকরণ ও ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক ছিলো, যাতে তা খাতিমুন্নাবিয়্যিনের উম্মতের জন্য পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত সুরক্ষিত নিয়মে পৌঁছতে পারে। এসব খাঁটি মণি-মুক্তার সঙ্গে যখনই কোনো ভেজাল মিশ্রিত হয়, তখনই তার সংরক্ষকগণ এবং শাস্ত্রবিশারদগণ তৎক্ষণাৎ দুধ ও পানিকে পৃথক করে খাঁটি থেকে মেকিকে বেছে নিতে পারেন। এই সংরক্ষণ-পদ্ধতির নামই রেওয়ায়েতে হাদিস এবং হাদিসের দোষ-ত্রুটি যাচাই করা। এই শাস্ত্রকেই বলা হয় হাদিসশাস্ত্র। এটাই সেই পবিত্র ও মহান খেদমত, যা কেবল নিজেদেরই নয়, বরং অপরদের থেকেও প্রশংসা অর্জন করেছে এবং এই খেদমতকে ইসলামের বিশেষ নিদর্শন বলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সেসব বাণী ও কার্যাবলির রেওয়ায়েতের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে খাঁটি ও মেকি যাচাই করার জন্য রাসুলের নবুওতের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যে-খেদমত হয়ে আসছে, তার গুরুত্ব এ-কথা থেকেই প্রকাশ পেতে পারে যে, হাদিস রেওয়ায়েত করার শাস্ত্রটি প্রায় চৌদ্দ প্রকার বিষয় ও শাখাবিষয়ের মধ্যে বিভক্ত। সুতরাং, এটা একান্ত আবশ্যক যে, আমরা কোনো একটি রেওয়ায়েত বা রেওয়ায়েতের একটি বাক্যকে—যা তার শাব্দিক অর্থ ও বাহ্যিক বর্ণনায় আকিদা-সম্পর্কিত জরুরি বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করে—সহিহ, মাকবুল, মাশহুর এবং মুতাওয়াতির হাদিসকে অস্বীকার করার ওপর দলিল ও প্রমাণ প্রতিষ্ঠা না করি এবং সেটিকে হাদিস অবিশ্বাস বা অস্বীকার করার কারণ বানিয়ে কুরআন মাজিদকে এমন এক অভিনব-অপরিচিত গ্রন্থ না বানিয়ে দিই, যার ব্যাখ্যা করার জন্য কোনো নবীর বিশ্লেষণমূলক বাণীও নেই এবং ব্যাখ্যাস্বরূপ কার্যাবলিও নেই; বরং তা যেনো কোনো অনাবাদ

ভূমি বা পাহাড়ের ওপর নাযিল হয়েছে, যা কেবল নিজের ভাষার জ্ঞান ও অভিধানের মাধ্যমেই বুঝা যেতে পারে।

অবশ্য এ-সত্যকেও ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, রাসুলুল্লাহ সা.-এর যাবতীয় বাণী বা হাদিস অবিকল তাঁর শব্দে শব্দে রেওয়ায়েত করা হয় নি; বরং কোনো কোনো রেওয়ায়েতে হাদিসের মর্মার্থ রাবি নিজের শব্দে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ এমন হয় নি যে, রাসুলুল্লাহ সা. যে-শব্দগুলো পবিত্র মুখে উচ্চারণ করেছেন, রাবি তার প্রতিটি শব্দ অনুরূপভাবে রেওয়ায়েত করেছেন। বরং রাসুল সা.-এর উচ্চারিত শব্দগুলোর মর্মার্থ স্মরণে রেখে রাবি তাকে নিজের শব্দে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালার প্রতি লক্ষ রাখার পর এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়কেও এইভাবে অনুধাবন করা যায় যে, সহিহ বুখারির হাদিসগুলো সন্দেহাতীতভাবে সর্বজনের স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং এটাও স্বীকার করে নেয়া যায় যে, এ-কিতাবটি আলোচনা ও সমালোচনার কষ্টিপাথরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উম্মতের মধ্যে প্রসিদ্ধি এবং স্বীকৃতির এমন স্তরে পৌঁছেছে যে তা আল্লাহর কিতাব কুরআনের পর সর্বাপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত হয়েছে। তারপরও এটা সম্ভব যে, তার কোনো রেওয়ায়েতে রাসুল সা.-এর বাণীর মর্মার্থ রাবির নিজের বর্ণনার শব্দচয়নে ত্রুটিযুক্ত হয়ে পড়েছে। সেই রেওয়ায়েতটি সনদ ও ইবারতের পরিপ্রেক্ষিতে যদিও নীতিগতভাবে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু সেই বাক্যটির বর্ণনাকে দুর্বল ও ত্রুটিযুক্ত মনে করা হবে এবং মূল রেওয়ায়েতটিকে প্রত্যাখ্যান করার পরিবর্তে কেবল সেই বাক্যটির দুর্বলতা ও ত্রুটিকে প্রকাশ করে দেয়া হবে। যেমন এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সহিহ বুখারির মেরাজের হাদিসটিতে রয়েছে।

মুহাদ্দিসিনে কেরাম সবাই এ-কথার ওপর একমত যে, সহিহ মুসলিম শরিফে রাসুল সা.-এর মেরাজ সম্পর্কে যে-রেওয়ায়েতটি হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে তার মোকাবিলায় সহিহ বুখারির আবদুল্লাহ বিন আবি নামিরা থেকে বর্ণিত হাদিসটিতে দুর্বলতা ও ত্রুটি রয়েছে। তার তারতিবের মধ্যে ভুল বিদ্যমান। পক্ষান্তরে সহিহ মুসলিমের রেওয়ায়েতটি ওইসব দুর্বলতা ও দোষ থেকে মুক্ত। অথচ এই দুটি রেওয়ায়েতই রেওয়ায়েত ও দেরায়েত হিসেবে সহিহ ও গ্রহণযোগ্য।

কাজেই কোনো সন্দেহ ও ইতস্ততা করা ব্যতীত এ-বিষয়টি স্বীকার করে নেয়া উচিত যে, হযরত ইবরাহিম আ.-সম্পর্কিত উপরিউক্ত দীর্ঘ

রেওয়ায়েত দুটি মর্মার্থ বর্ণনা-করা জাতীয় রেওয়ায়েতগুলোর অন্তর্গত। এবং এই দাবি কখনো করা যেতে পারে না যে, রেওয়ায়েত দুটির শব্দ ও বাক্যাবলির বর্ণিত পূর্ণরূপ রাসুল সা.-এর পবিত্র যবান থেকে নিঃসৃত শব্দ ও বাক্যাবলিরই হুবহু রূপ; বরং এগুলো তাঁর কথার মর্মার্থকে বর্ণনা করছে মাত্র। অতএব, রেওয়ায়েত দুটির মধ্যে হয়তো বর্ণিত ঘটনাবলি বিশুদ্ধ ও সঠিক হওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য শব্দগুলো সনদের মধ্যস্থিত কোনো রাবির নিজের বর্ণনায় শব্দচয়ন ও বিন্যাসের ফল এবং সে-কারণেই এই দোষ সৃষ্টি হয়েছে।

বিশেষত, এর জন্য এই সংকেতও বিদ্যমান রয়েছে যে, হযরত ইবরাহিম আ., হযরত সারা রা. এবং মিসরের রাজার ওই ঘটনাটির উল্লেখ তাওরাতেও রয়েছে এবং সেখানে এ-জাতীয় অসাবধানতামূলক বহুসংখ্যক বাক্য বিদ্যমান। সুতরাং এটা সম্ভবপর যে, এই ইসরাইলি রেওয়ায়েত সহিহ রেওয়ায়েতের মধ্যে মিশে গেছে। কাজেই বর্ণনাকারী হয়তো উপরিউক্ত আলোচ্য শব্দগুলো দ্বারাই বিষয়টি বর্ণনা করে দিয়েছেন।

কওমের হেদায়েতের জন্য হযরত ইবরাহিম আ.-এর অস্থিরতা

আগের আলোচনা থেকে এটা ভালোভাবেই অনুমান করা যায় যে হযরত ইবরাহিম আ. তাঁর কওমের হেদায়েতের জন্য কী পরিমাণ তৎপর ও অস্থির ছিলেন। তিনি দলিল ও প্রমাণসমূহের এমন কোনো ছুরত নেই যে তা সত্য প্রকাশের জন্য কাজে লাগান নি। সর্বপ্রথম তাঁর পিতা আযারকে বুঝালেন। তারপর সর্বসাধারণের সামনে সত্যের আলো পেশ করলেন। অবশেষে নমরুদের সঙ্গে বিতর্ক করে তার সামনেও সত্যকে সত্য বলে প্রমাণ করার কর্তব্যকে উত্তম থেকে উত্তম পন্থার সঙ্গে পালন করলেন। প্রতিটি সময় সবাইকে এই শিক্ষ দিলেন যে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করা জায়েয নয়। আর মূর্তিপূজা ও নক্ষত্রপূজার পরিণাম ক্ষতি ও অপমান ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং শিরক থেকে নিবৃত্ত হওয়া আবশ্যক কর্তব্য এবং হানিফি ধর্মকেই সিরাতুল মুস্তাকিম বলে বিশ্বাস করা উচিত। যার ভিত্তি ও বুনিয়াদ একমাত্র আল্লাহ তাআলার একত্বের ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু তাঁর হতভাগ্য সম্প্রদায় কোনো কথাই শুনলো না এবং কোনোভাবেই হেদায়েত ও নসিহত কবুল করলো না। তা ছাড়া ইবরাহিম আ.-এর স্ত্রী হযরত সারা রা. এবং তাঁর ভাতিজা হযরত লুত আ. ব্যতীত আর একজন লোকও ঈমান আনলো না। গোটা সম্প্রদায় হযরত ইবরাহিম আ.-কে অগ্নিকুণ্ডে পুড়িয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। তাঁকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলো। কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলার শত্রুদের অভিলাষকে হীন ও অপদস্থ করে ইবরাহিম আ.-এর জন্য আগুনকে শীতল ও শান্তিময় করে তাঁকে রক্ষা করলেন। তখন ইবরাহিম আ. অন্য কোথাও গিয়ে আল্লাহপাকের পয়গাম শোনাতে এবং সত্যের দাওয়াত পৌঁছাতে মনস্থির করলেন। এই ভেবে তিনি বাবেলে নমরুদের রাজত্বের অন্তর্গত তাঁর প্রিয় জন্মস্থান 'ফাদ্দানে আরাম' নামক বিখ্যাত শহর থেকে হিজরত করার সংকল্প করলেন। যেমন, কুরআন মাজিদে উল্লেখ করা হয়েছে—

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (سورة الصافات)

'সে (হযরত ইবরাহিম আ.) বললো, "আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম, তিনি আমাকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করবেন।" [সূরা আস-সাফফাত : আয়াত ৯৯]

অর্থাৎ, এখন আমার এমন কোনো জনপদে হিজরত করে চলে যাওয়া উচিত যেখানে আল্লাহর হকের আওয়াজ সত্য-শ্রবণকারী কান দ্বারা শোনা হবে। আল্লাহর জমিন সংকীর্ণ নয়। যেখানেই হোক, আমার কাজ হলো আল্লাহর সত্যের পয়গাম পৌঁছে দেয়া। আল্লাহ তাঁর দীনপ্রচারের সরঞ্জাম নিজেই জোগাড় করে দেবেন।

কালদানি সম্প্রদায়ের দিকে হিজরত

যাইহোক। হযরত ইবরাহিম আ. তাঁর পিতা আযার ও সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফোরাত নদীর পশ্চিম তীরের নিকটবর্তী এক জনপদে চলে গেলেন। এই জনপদের অধিবাসীরা কালদানি সম্প্রদায় নামে বিখ্যাত ছিলো। এখানে তিনি কিছুকাল অবস্থান করলেন। হযরত সারা রা. এবং হযরত লুত আ. তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কিছুকাল পরে এখান থেকে খারান বা হারানের দিকে যাত্রা করলেন। ওখানে গিয়ে হানিফি দীনের দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইবরাহিম আ. বার বার

আল্লাহর দরবারে নিজের পিতা আযারের ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করতেন এবং তার হেদায়েত লাভের জন্য দোয়া করতেন। তা এইজন্য করতেন যে, তিনি অত্যন্ত দয়ালু, কোমল-হৃদয় ও সহনশীল ছিলেন। এ-কারণেই আযারের পক্ষ থেকে সব ধরনের শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও তিনি আযারকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, "যদিও আমি আপনাকে ছেড়ে যাচ্ছি এবং আফসোস যে, আপনি আল্লাহর হেদায়েতের প্রতি লক্ষ করলেন না, তারপরও আমি সবসময় আল্লাহর দরবারে আপনার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করতে থাকবো। অবশেষে আল্লাহর ওহি হযরত ইবরাহিম আ.-কে জানিয়ে দিলো যে, আযার ঈমান আনবে না এবং সে ওইসব লোকের মধ্যে অন্যতম যারা নিজেদের উত্তম যোগ্যতাকে নষ্ট করে এমন নাফরমান হয়ে পড়েছে যাদের সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেছেন—

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

'আল্লাহ তাদের হৃদয় ও কর্ণ মোহর করে দিয়েছেন,[২২] তাদের চক্ষুর ওপর আবরণ রয়েছে এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। [সুরা বাকারা : আয়াত ৭]

হযরত ইবরাহিম আ. এ-কথা জানতে পেরে আযারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কহীনতা পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করে দিলেন এবং বললেন, আমার পিতা সম্পর্কে আমি যে-কল্পিত আশা পোষণ করছিলাম তার অবসান ঘটেছে। সুতরাং এখন তার মাগফেরাতের দোয়া অব্যাহত রাখা বৃথা। কুরআন মাজিদ ঘটনাটিকে ব্যক্ত করেছে এভাবে—

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (سورة التوبة)

'ইবরাহিম তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলো, তাকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো বলে; (তিনি মাগফেরাত কামনার ব্যাপারে তাঁর পিতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।) এরপর যখন ইহা তার কাছে (ওহির

---

[২২] কাফেররা কুরআন কর্তৃক নির্দেশিত পথ ত্যাগ করে নিজেদেরকে অসত্যের পথে পরিচালিত করায় তাদের অন্তর সৎ-উপদেশ গ্রহণে অযোগ্য, কান হিতোপদেশ শোনায় অসমর্থ এবং চোখ সৎপথ দেখায় বাধাপ্রাপ্ত। একে রূপক অর্থে মোহর করে দেয়া ও দৃষ্টিশক্তির ওপর আবরণ বলা হয়েছে। মোহর করে দেয়ার শাব্দিক অর্থ 'সিল করে বন্ধ করে দেয়া'।

মাধ্যমে) স্পষ্ট হলো যে, সে আল্লাহর শত্রু (অর্থাৎ পরিণামেও সে কাফেরই থাকবে) তখন ইবরাহিম তার সম্পর্ক ছিন্ন করলো। (সম্পর্কহীনতার ঘোষণা করে দিলেন।) ইবরাহিম তো কোমল-হৃদয়, সহনশীল। [সুরা তাওবা : আয়াত ১১৪]

ফিলিস্তিনের দিকে হিজরত

অতঃপর ইবরাহিম আ. এভাবে দীন প্রচার করতে করতে ফিলিস্তিনে গিয়ে পৌছলেন। এই সফরেও তাঁর সঙ্গী ছিলেন হযরত সারা রা., হযরত লুত আ. এবং লুত আ.-এর স্ত্রী। সুরা আনকাবুতে উল্লেখ করা হয়েছে—

فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورة العنكبوت)

'লুত তার (হযরত ইবরাহিম আ.-এর) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো। ইবরাহিম বললো, আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করছি। তিনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' [সুরা আনকাবুত : আয়াত ২৬]

হাদিসে এসেছে, উসমান বিন আফফান রা. যখন তাঁর পবিত্র স্ত্রী রুকাইয়া বিনতে রাসুলুল্লাহ সা.-কে সঙ্গে নিয়ে আবিসিনিয়ার (বর্তমান ইথিওপিয়া) হিজরত করে গিয়েছিলেন, তখন রাসুলুল্লাহ সা. বলেছিলেন, 'নিঃসন্দেহে লুত আ.-এর পরে উসমানই সর্বপ্রথম মুহাজির যিনি স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করেছেন।'

হযরত ইবরাহিম আ. ফিলিস্তিনের পশ্চিম অঞ্চলে বসতি স্থাপন করলেন। সেকালে এই অঞ্চলটি কিনআনিদের অধীন ছিলো। তার কিছুকাল পরে ইরাহিম আ. শাকিমে (নাবলুস) চলে গেলেন। এখানে কিছুকাল অবস্থান করলেন। এখানেও তিনি বেশিদিন না থেকে ক্রমাগত পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত মিসরে গিয়ে পৌছলেন।

মিসরে হিজরত এবং হযরত হাজেরা রা.

নাবলুস থেকে হিজরত করে যখন তাঁরা মিসরে পৌছলেন, তখন সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম শরিফের রেওয়ায়েত অনুযায়ী জালিম রাজার সেই ঘটনাটি ঘটলো যা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর তাওরাতে এই ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে :

“এরপর ইবরাহিম যখন মিসরে পৌঁছলেন, মিসরবাসীরা দেখলো তাঁর সঙ্গে যে-স্ত্রীলোকটি আছেন তিনি অত্যন্ত সুন্দরী। ফেরআউনের (মিসরের রাজার উপধি) আমিরগণ তাঁকে দেখলো এবং ফেরআউনের কাছে তাঁর রূপের খুব প্রশংসা করলো এবং তাঁকে ফেরআউনের গৃহে নিয়ে গেলো। ফেরআউন এর বিনিময়ে ইবরাহিমের প্রতি অনুগ্রহ করলো। তাঁকে ভেড়া, বকরি, গাভী, বলদ, গাধা-গাধী, দাস-দাসী, বাঁদি ও উট প্রদান করলো। এরপর আল্লাহ তাআলা ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়কে ইবরাহিমের স্ত্রী সারার কারণে ভীষণ মার মারলেন। তখন ফেরআউন ইবরাহিমকে ডেকে পাঠিয়ে বললো, তুমি আমার সঙ্গে এটা কী করলে? তুমি কেনো বললে না, এই মেয়েলোকটি আমার স্ত্রী? তুমি কেনো বললে, সে আমার বোন? এমনকি আমি তাকে আমার স্ত্রী করে নেবার জন্য গ্রহণ করলাম? দেখো, এই যে তোমার স্ত্রী উপস্থিত। একে নিয়ে চলে যাও। আর ফেরআউন ইবরাহিম সম্পর্কে লোকদের আদেশ করলো, তখন তারা তাঁকে, তাঁর স্ত্রীকে এবং তাঁর সঙ্গে যা-কিছু ছিলো সবকিছুসহ রওয়ানা করিয়ে দিলো।”[২৩]

সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমের রেওয়ায়েত এবং তাওরাতের বর্ণিত রেওয়ায়েতটির মধ্যে পার্থক্য এই যে, সহিহ বুখারি ও মুসলিম শরিফে হযরত সারা রা.-এর বদদোয়ার ফলে অত্যাচারী রাজা ফেরআউন তার পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়াকে শয়তানের (জিনের) প্রভাব মনে করে সারা থেকে নিজের প্রাণ বাঁচালো আর হযরত হাজেরাকে তাঁর হাতে ন্যস্ত করে দিয়ে ইবরাহিম আ.-কে সাথিবৃন্দ ও মালসামানাসহ মিসর থেকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলো। ইবনে হাজার আসকালানির ফতহুল বারি কিতাবে এ-কথা রয়েছে যে, মিসরবাসীরা জিন জাতির সম্মানে বিশ্বাসী ছিলো। সুতরাং এখানে শয়তান বলতে জিনই উদ্দেশ্য।

আর তাওরাতের রেওয়ায়েতটি বলছে, ফেরআউন সারা রা.-এর ঘটনাটিকে তাঁর কারামত মনে করে ইবরাহিম আ.-কে এইভাবে তিরস্কার করলো যে, তিনি প্রথমেই কেনো ফেরআউনকে বললেন না যে সারা তাঁর বোন নন, বরং স্ত্রী। এরপর তাঁকে অনেক পুরস্কার, সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে মিসর থেকে বিদায় দিয়ে দিলো।

---

[২৩] আবির্ভাব অধ্যায় : অনুচ্ছেদ ১২, আয়াত ১৪-২০।

যাইহোক। বুখারি ও মুসলিম শরিফের রেওয়ায়েতই হোক আর তাওরাতের রেওয়ায়েতই হোক, উভয় রেওয়ায়েতই মর্মার্থের দিক থেকে খুব কাছাকাছি এবং দুটির মধ্যে মৌলিকভাবে কোনো পার্থক্য নেই।

অবশ্য এসব রেওয়ায়েত থেকে যেসব কথা নিশ্চিতভাবে বুঝা যায় তা হলো, হযরত ইবরাহিম আ. তাঁর স্ত্রী সারা রা. এবং ভ্রাতুষ্পুত্র লুত আ.-সহ মিসর গিয়েছিলেন। সেই সময় মিসরের রাজত্ব এমন এক বংশের লোকদের হাতে ছিলো যারা 'সামি' সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতো। এভাবে হযরত ইবরাহিম আ.-এর সঙ্গে তাদের বংশগত সংশ্লিষ্টতা ছিলো। মিসরে পৌঁছার পর ইবরাহিম আ. ও ফেরআউনের মধ্যে অবশ্যই এমন কিছু ঘটনা ঘটেছিলো, যার মাধ্যমে সে নিশ্চিতভাবে বুঝে ফেলেছিলো যে ইবরাহিম আ. ও তার বংশ আল্লাহর প্রিয় ও মনোনীত বংশ। এটা দেখে ফেরআউন ইবরাহিম আ. ও তাঁর স্ত্রীকে খুব সম্মান করেছিলো। তাঁদের নানা প্রকারে ধন-দৌলত ও উপঢৌকনসামগ্রী প্রদান করেছিলো। ফেরআউন শুধু এতটুকুকেই যথেষ্ট মনে করে নি; বরং নিজের প্রাচীন বংশগত সম্পর্ক সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে তার কন্যা হাজেরাকেও ইবরাহিম আ.-এর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলো, যিনি তৎকালীন প্রথা অনুসারে স্বামীর প্রথমা স্ত্রীর খাদেমা সাব্যস্ত হলেন। এই ঐতিহাসিক অনুমান ও ধারণার প্রধান সাক্ষ্য ইহুদিদের কাছেও বিদ্যমান।

ইহুদিদের নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থ 'সিফরুল ইয়াশা'য় উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহিম আ.-এর কালে মিসরের বাদশা তাঁর স্বদেশী লোক ছিলো।[২৪]

আর এইভাবে ইহুদিদের গ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েতগুলোর মাধ্যমে এ-বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হযরত হাজেরা রা. মিসরের বাদশা ফেরআউনের কন্যা ছিলেন। তিনি দাসী বা বাঁদি ছিলেন না। তাওরাতের একজন নির্ভরযোগ্য মুফাস্‌সির রাব্বি শিলুমিলু ইসহাক তাওরাতের আবির্ভাব অধ্যায় : পরিচ্ছেদ ১৬, আয়াত ১-এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যখন সে (রাকইউঁ শাহে মিসর / মিসরের বাদশা) সারার কারামত

[২৪] আরদুল কুরআন : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১।

দেখলো, "বললো, আমার কন্যা এর ঘরে বাঁদি হয়ে থাকা অন্য ঘরে রাণী হয়ে থাকার চেয়ে উত্তম।"[২৫]

এই তাফসির এবং তাওরাতের আয়াত একত্র করলে এই সত্যটি সুন্দরভাবে স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে, তাওরাতে হযরত হাজেরা শুধু এ-কারণে বাঁদি বলা হয়েছে যে, মিসরের বাদশা তাঁকে ইবরাহিম আ. ও সারা রা.-এর হাতে ন্যস্ত করে দেয়ার সময় বলেছিলো, "সে হযরত সারার খেদমতগার হয়ে থাকবে।" এর অর্থ এই ছিলো না যে তিনি বাঁদি ছিলেন।[২৬] কেননা, রাব্বি শিলুমিলু বর্ণনা করেছেন, হযরত হাজেরা মিসরের বাদশা ফেরআউনের কন্যা ছিলেন। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে সহিহ বুখারি শরিফে জালিম বাদশা সম্পর্কিত যে-হাদিসটি উদ্ধৃত হয়েছে তাতেও এই বাক্যটির উল্লেখ আছে এবং তা রাব্বি শিলুমিলুর তাফসিরের সমর্থন করছে।

فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ

'আর হাজেরাকে হযরত সারার হাতে ন্যস্ত করে দিলেন, যেনো তিনি তাঁর খেদমতগার থাকেন।'[২৭]

সুতরাং বনি ইসরাইলের এই বিদ্রূপ সত্য ও শুদ্ধ নয়—বনি-ইসমাইল আমদের চেয়ে নীচ ও হীন এই কারণে যে, তারা বাঁদির বংশধর এবং আমরা হযরত ইবরাহিম আ.-এর স্ত্রী সারার বংশধর। তাদের এই উক্তি প্রকৃত ঘটনা ও ইতিহাস-বিরোধী। আর তাওরাতের অন্যান্য বিষয়বস্তুতে যেমন পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হয়েছে, তেমনি এ-বিষয়টিতেও পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হয়েছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ত্যাগ করে কেবল 'বাঁদি' শব্দটি অবশিষ্ট রাখা হয়েছে।

হাজেরা মূলত হিব্রু ভাষার শব্দ 'হাগার'। হাগার শব্দের অর্থ অপরিচিত ও অনাত্মীয়।[২৮] যেহেতু তার জন্মভূতি ছিলো মিসর, তাই এই নামটি চালু হয়ে গেছে। কিন্তু ওই নীতি অনুসারে ধারণা ও অনুমানের নিকটবর্তী হলো, হাগার শব্দের অর্থ 'পৃথক' বা 'বিচ্ছিন্ন'। আরবিতে হাজের শব্দের অর্থই তা-ই। ইনি যেহেতু নিজ জন্মভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বা হিজরত

[২৫] আরদুল কুরআন : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১।
[২৬] বারাহিনে বাহেরা ফি হুররিয়াতি হাজেরা. মাওলানা গোলাম রসুল চিড়িয়াকুটি।
[২৭] সহিহুল বুখারি : হাদিস ৩৩৫৮।
[২৮] আরদুল কুরআন : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০।

করে হযরত ইবরাহিম আ.-এর জীবনসঙ্গিনী এবং হযরত সারা খেদমতগার হয়েছিলেন, সেই সামঞ্জস্যে হাজেরা নামে অভিহিত হয়েছিলেন।

হযরত ইবরাহিম আ. এবং দুটি গুরুত্বপূর্ণ মাকাম

হযরত ইবরাহিম আ.-এর শিরোনামের অধীন আলোচনা শেষ করার পূর্বে দুটি গুরুত্বপূর্ণ মাকামের উল্লেখ করা খুবই জরুরি। এই দুটি মাকামের সঙ্গে হযরত ইবরাহিম আ.-এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আর তা মিল্লাতে ইবরাহিমের জন্য জ্ঞানগর্ভ মাকাম। তা মুজাদ্দিদুল আম্বিয়া হযরত ইবরাহিম আ.-এর নবীসুলভ মহত্ব ও মর্যাদাকে আরো অধিক উজ্জ্বল করে দেয়।

প্রথম মাকাম

সূরা মুমতাহিনার মধ্যে হযরত ইবরাহিম আ.-এর একটি বিশেষ দোয়ার আলোচনা করা হয়েছে। তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রার্থনার হাত প্রসারিত করে কাকুতি ও মিনতি এবং বিনয়ের সঙ্গে এই আবেদন করেছিলেন—

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورة الممتحنة)

'হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদেরকে কাফেরদের পীড়নের পাত্র (ফেতনা) করো না। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো; তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' [সূরা মুমতাহিনা : আয়াত ৫]

فتنة শব্দটি فتن থেকে গৃহীত। যখন স্বর্ণকে এ-কারণে পোড়ানো হয় যে, তার কৃত্রিম অংশ ও ময়লা পুড়ে গিয়ে খাঁটি অংশটুকু অবশিষ্ট থেকে যায়, এমন ক্ষেত্রে বলা হয় فتن الذهب। বর্তমানে পরীক্ষা, বিপদাপদ ও পরখ করাকে বলে। এজন্য মানুষের ওপর যেসব বালা-মুসিবত আসে তাকে এই সামঞ্জস্যেই ফেতনা বলা হয়। কুরআন মাজিদেও ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং খ্যাতি ও মর্যাদাকে এই অর্থের প্রতি লক্ষ করেই ফেতনা বলা হয়েছে এবং পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সত্যবাদী ও

মিথ্যাবাদী যাচাই করার জন্য 'মুমিন'কে অবশ্যই কষ্টিপাথরে পরখ করা হয়। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (سورة العنكبوت)

'মানুষ কি মনে করে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" এই কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করেই অব্যাহতি দেয়া হবে?' [সুরা আনকাবুত : আয়াত ২]

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (سورة الأنفال)

'এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকো যতক্ষণ না ফেতনা[২৯] দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যদি তারা বিরত হয় তবে তারা যা করে আল্লাহ তো তার সম্যক দ্রষ্টা।' [সুরা আনফাল : আয়াত ৩৯]

এখানে চিন্তা করার বিষয় হলো, হযরত ইবরাহিম আ.-এর এই দোয়ার অর্থ কী? তিনি কাফেরদের জন্য ফেতনা না হওয়া সম্পর্কে কী ইচ্ছা পোষণ করতেন?

অভিরুচির বিভিন্নতার কারণে আহলে হক উলামায়ে কেরাম এই জিজ্ঞাসার তিন ধরনের জবাব দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের তিনটি হাকিকতের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করার পর এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, হযরত ইবরাহিম আ.-এর এই দোয়া তাঁর সবিস্তার ও সূক্ষ্ম বর্ণানর প্রেক্ষিতে একই সময়ে তিনটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করছে :

এক.

হযরত ইবরাহিম আ. রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে এই প্রার্থনা করছেন যে, হে বিশ্বের প্রতিপালক, আমাকে এমন জীবন দান করুন, যেনো আমার কথা, কাজ এবং আমার আচার-আচরণ ও গতিবিধি أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ অর্থাৎ উত্তম আদর্শেরই বিকাশ হয়। আমি যদি হেদায়েতকারী হয় তাহলে যেনো উত্তম আদর্শের হই। আর যদি সমাজপতি বা নেতাই হই, তাহলে আমাকে সৎপথ ও হেদায়েত এবং তার ওপর স্থিরতা দান করো। এমন যেনো না হয় যে আমি মন্দ আদর্শের পথপ্রদর্শক এবং নেতা হয়ে যাই

[২৯] ফেতনা অর্থ পরীক্ষা, প্রলোভন, দাঙ্গা, বিশৃঙ্খলা, গৃহযুদ্ধ, শিরক, কুফর, ধর্মীয় নির্যাতন ইত্যাদি।

আর কিয়ামতের দিন উম্মতের পথভ্রষ্টরা ও কাফেররা আপনার দরবারে আমাকে এই বলে লজ্জিত করে যে—

رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (سورة الأحزاب)

'হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের (প্রধানদের / সমাজপতিদের) আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলো।' [সুরা আহযাব : আয়াত ৬৭]

অর্থাৎ তিনি এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন যে, যদি পথপ্রদর্শন এবং নেতৃত্ব তাঁর ভাগ্যে থাকে, তবে তিনি যেনো উত্তম আদর্শ ত্যাগ না করেন, যাতে কিয়ামতের দিন আল্লাহর বন্ধুদের দলে স্থান পেতে পারেন। আর তাঁর জীবনের গতিধারা যেনো শয়তানের বন্ধুদের শত্রু হয়ে যায়। আয়াতটির পূর্বাপর সম্পর্ক এই অর্থটির পূর্ণ সমর্থন করছে। কারণ এই আয়াতটির পূর্বে মুশরিকদের মোকাবিলায় হযরত ইবরাহিম আ. এবং তাঁর নেক উম্মতদের এই ঘোষণাটির উল্লেখ রয়েছে—

وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ (سورة الممتحنة)

'তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হলো শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যদি না তোমরা এক আল্লাহতে ঈমান আনো। [সুরা মুমতাহিনা : আয়াত ৪]

আর আলোচ্য আয়াতটির পর পুনরায় হযরত ইবরাহিম আ. ও তাঁর অনুসারী মুমিনগণের উত্তম আদর্শের আলোচনা রয়েছে। সুরাটির শুরুতেও হযরত ইবরাহিম আ.-এর উত্তম আদর্শের উল্লেখ বিদ্যমান।

দুই.

হযরত ইবরাহিম আ. তাঁর এই ব্যাপক অর্থবোধক শব্দগুলোর মধ্যে আল্লাহর দরবারে এই আরজি জানাচ্ছেন যে, আপনি আমাকে কাফেরদের হাতে পরীক্ষা করার জন্য ছেড়ে দেবেন না। তারা আমাকে ঈমান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে কুফর ও শিরক গ্রহণ করার জন্য পদে পদে বিপদ-আপদ এবং দুঃখ-দুর্দশার শিকার বানিয়ে ছাড়বে। উৎপীড়ন ও অত্যাচারের মাধ্যমে আমাকে সৎপথ থেকে অসৎপথে নেয়ার চেষ্টায় সাহসী হয়ে উঠবে।

এই অর্থটির নিদর্শন হলো, আলোচ্য আয়াতটির পূর্বে এই আলোচনা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহিম আ. এবং তাঁর উম্মত, যারা তাঁর দাওয়াত কবুল করেছিলো, মর্যাদাবান ও প্রতাপশালী কাফেরদের দলের সামনে সাহসের সঙ্গে এই ঘোষণা দিয়েছিলেন, كَفَرْنَا بِكُمْ 'তোমরা যা-কিছু বিশ্বাস করো আমরা সেগুলোকে অস্বীকার করি।' আর আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ইসলাম স্বীকার ও কবুল করা এবং না করা বিষয়ে প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সুতরাং, এমতাবস্থায় অত্যন্ত জরুরি ছিলো যে, একজন আল্লাহভক্ত মানুষ, উচ্চ মর্যাদাবান নবী, উঁচু স্তরের পথপ্রদর্শক নিজের মানবিক দুর্বলতার প্রতি লক্ষ করে আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করবেন, হে অসীম ক্ষমতার অধিকারী, আপনি কোনোক্রমেই এবং কোনো অবস্থাতেই কাফেরদেরকে আমাদের ওপর প্রভাবশালী করবেন না। আর কাফেররা কোনোক্রমেই যেনো আমাদের ওপর এমন ক্ষমতা লাভ করতে না পারে, যাতে ঈমান ও কুফর সম্পর্কিত আমাদের এই ঘোষণা পরীক্ষা ও যন্ত্রণার কারণ হয়ে যায় এবং মুশরিকরা আমাদেরকে কুফরের দিকে ফিরিয়ে নেয়ার দুঃসাহস করতে পারে।

তিন.

হযরত ইবরাহিম আ. এখানে 'ফেতনা' বলে 'আযাব' অর্থ গ্রহণ করেছেন। কেননা, ফেতনার বিভিন্ন রূপের মধ্যে একটি ভয়ংকর রূপ হলো আযাব। তিনি আবেদন করছেন যে, হে আমার প্রতিপালক, আমাদেরকে এমন অবস্থায় কখনো পৌছাবেন না যাতে আমাদেরকে কাফের ও মুশরিকদের হাতে বিভিন্ন রকমের আযাবে আক্রান্ত হতে হয় এবং শেষফল এই দাঁড়ায় যে, নিজেদের হীনতা, দরিদ্রতা, অপমান ও গোলামি এবং শত্রুদের পার্থিব সম্মান, মর্যাদা, উন্নতি এবং শাসকসুলভ মর্যাদা দেখে বলে উঠি, আমরা যদি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতাম, তবে এই হীনতা ও ক্ষতির মধ্যে নিপতিত হতাম না। আর শিরক ও কুফর যদি আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে ঘৃণার বিষয় হতো, তবে এই কাফের ও মুশরিকের দল মান-মর্যাদা ও উন্নতি লাভ করতো না। অর্থাৎ, তখন আমরা সত্য আর অসত্যের মধ্যে পার্থক্যই করতে পারবো না। সুতরাং, আমাদেরকে এ-ধরনের ফেতনা থেকে চিরকালের জন্য সুরক্ষিত রাখুন।

হযরত ইবরাহিম আ.-এর দোয়ার এই অংশটি আমাদের জন্য লক্ষ লক্ষ উপদেশ ও জ্ঞান লাভের উপকরণ। কারণ, বিগত দেড় শতাব্দী থেকে বিশেষ করে ইসলামি বিশ্ব নিজেদের হাতে রচিত অনৈসলামিক চাল-চলনের ফলে যেভাবে অনৈসলামিক শক্তি, শাসকসুলভ উৎপীড়ন এবং যুলুমের নিচে চাপা পড়েছে এবং সবদিক থেকে অক্ষম ও নিরুপায় দেখা যাচ্ছে, তা আমাদেরকে এত তুচ্ছ ও হীন করে দিয়েছে যে, আমাদের মধ্য থেকে চিন্তা ও কর্মশক্তিগুলো লোপ পেয়ে গেছে। হীনতার অনুভূতিতে বিভোর হয়ে আমাদেরকে নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্ত মনে এ-কথা বলতে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলাম আল্লাহর ইবাদতের নামও নয় এবং সত্য আকিদা ও সৎকাজে পরিপুষ্ট জীবনের নামও নয়; বরং জড়বাদী শক্তি ও শাসনক্ষমতা এবং তার মাধ্যমে বিলাসিতা ও আনন্দভোগের অপর নাম ধর্ম বা ইসলাম। আর নামায, রোযা, হজ, যাকাত এই জড়বাদী শক্তি অর্জনের জন্য ডিসিপ্লিন এবং নীতি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার জন্য এক ধরনের কর্মপন্থামাত্র। আর এটাই জান্নাতের স্বরূপ, সত্যপন্থীদের জন্য কুরআন মাজিদে যার ওয়াদা করা হয়েছে। সুতরাং, যদি এগুলো না-ই হলো, তবে এর অপর নাম জাহান্নাম। আর তারা বলে, পরকালের প্রতিশ্রুতি, হাশর, জান্নাত, জাহান্নাম—এ-সবকিছু নিছক মেনে নেয়া কল্পনা অর্থাৎ কাল্পনিক বিষয়মাত্র। কখনো এগুলো অস্তিত্বে আসবে না। নাউযুবিল্লাহ—আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

আর যেসব জাতি পৃথিবীতে শক্তি ও মানমর্যাদা এবং তার মাধ্যমে আনন্দ ও ভোগবিলাসিত লাভ করেছে, কুরআনে বর্ণিত সত্যিকার মুমিন তারাই এবং তারাই এসব বৈশিষ্ট্যের হকদার। ওইসব খোদাপূজারী মুসলমান তার হকদার নয়, যারা এই ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত ও অক্ষম। যেমন : আল্লামা মাশরেকি রচিত 'তাযকিরাহ' গ্রন্থটি এই মতবাদেরই প্রতিধ্বনি এবং সত্যধর্ম ইসলামের শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন ও অপরিচিত এবং বস্তুবাদের দ্বারা প্রভাবিত অধিকাংশ নব্য যুবকের বেপরোয়া চিন্তা ও নাস্তিক্যসুলভ প্রেরণা এই হীন ও পরাজিত স্বভাবেরই দর্পণ।

এটাই সেই ভয়ংকর রূপ, যার কল্পনা একত্ববাদের কেন্দ্র কা'বাগৃহের প্রতিষ্ঠাতা, ইবরাহিমি ধর্মের আহ্বায়ক, সত্যধর্মের প্রচারক, আল্লাহ তাআলার পবিত্র রাসুল হযরত ইবরাহিম আ.-কে কম্পিত করে দিয়েছিলো। তিনি কাকুতি-মিনতি ও বিনয়ের সঙ্গে ওই অপবিত্র জীবন

থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য আল্লাহপাকের দরবারে প্রার্থনার হাত প্রসারিত করে বললেন, আমাদের ওপর এরকম সময় কখনো যেনো না আসে, যাতে কুফরের শক্তি ও প্রতাপ এবং ক্ষমতা ও জাঁকজমক এমনভাবে পদদলিত করে যে, একত্ববাদের উপাসনাকারীরা সেই কঠিন ও কঠোর পরীক্ষায় পতিত হয়ে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে।

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ () رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورة الممتحنة)

'হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা তোমারই ওপর নির্ভর করেছি, তোমারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদেরকে কাফেরদের পীড়নের পাত্র করো না। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো; তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' [সুরা মুমতাহিনা : আয়াত ৪-৫]

দ্বিতীয় মাকাম

সুরা শুআরায় উপদেশ ও অন্তরদৃষ্টির প্রসঙ্গে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম-এর দাওয়াত, হেদায়েত ও সৎপথ প্রদর্শনের যে-আলোচনা রয়েছে, তার মধ্যে হযরত ইবরাহিম আ.-এর আলোচনাও রয়েছে। হযরত ইবরহিম আ. তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর একত্বের শিক্ষা এবং কুফর ও শিরকের প্রতি ঘৃণা ও অসন্তুষ্টির উৎসাহ প্রদান করছেন। এ-অবস্থাতেই তিনি আল্লাহর সত্তার একত্ব ও গুণাবলি সুন্দরভাবে বর্ণনা করে ধীরে ধীরে এক ও অদ্বিতীয় রবের দরবারে দোয়ার হাত প্রসারিত করছেন। যেনো তিনি ভিন্ন এক পদ্ধতিতে তাঁর কওমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এবাদতকারী বানাবার চেষ্টা করছেন। হযরত ইবরাহিম আ. দোয়া করতে করতে আল্লাহর দরবারে আবেদন জানাচ্ছেন—

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (سورة الشعراء)

'এবং আমাকে লাঞ্ছিত করো না পুনরুত্থান দিবসে।' (হে আল্লাহ, মানুষকে যেদিন পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে সেদিন আমাকে অপদস্থ করো না।) [সুরা শুআরা : আয়াত ৮৭]

এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারি তাঁর 'আল-জামিউস সহিহ' কিতাবে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে একটি হাদিস উদ্ধৃত করেছেন।

হাদিসটি 'কিতাবুত তাফসিরে' সংক্ষিপ্ত আকারে এবং 'কিতাবুল আম্বিয়াতে' বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হয়েছে। কিতাবুত তাফসিরে উদ্ধৃত হাদিসটির অনুবাদ নিচে দেয়া হলো :

"হযরত ইবরাহিম আ. কিয়ামতের দিন তাঁর পিতাকে বিষণ্ন অবস্থায় এবং মলিন চেহারায় দেখে বলবেন, হে আমার প্রতিপালক, পৃথিবীতে আপনি আমার এই দোয়া কবুল করে নিয়েছিলেন যে, আর যেদিন মানুষকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে, সেদিন আপনি আমাকে অপমানিত করবেন না। তবে আজ আমার এই অপমান কেনো—নিজের পিতাকে এমন অবস্থায় দেখছি? আল্লাহ তাআলা বলবেন, ইবরাহিম, আমি কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি।"

আর কিতাবুল আম্বিয়াতে এই হাদিসটির সঙ্গে নিম্নবর্ণিত কথাগুলো যুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে :

"যখন ইবরাহিম আ. কিয়ামতের দিন তাঁর পিতাকে ব্যাকুল ও অস্থির এবং মলিন চেহারাবিশিষ্ট দেখবেন, পিতাকে সম্বোধন করে বলবেন, আমি কি আপনাকে বার বার বলেছিলাম না যে, আমার হেদায়েতের পথের বিরোধিতা করবেন না। আযার বলবে, যা হওয়ার তা হয়েছে। আজকের দিনে আমি আর তোমার বিরোধিতা করবো না। তখন হযরত ইবরাহিম আ. আল্লাহপাকের দরবারে আরজ করবেন, হে আমার প্রতিপালক, আপনি পৃথিবীতে আমার এই দোয়া কবুল করে নিয়েছিলেন যে, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ; কিন্তু এর চেয়ে অধিক অপমান আর কী হতে পারে যে, আমার পিতা আযার আপনার রহমত থেকে দূরত্বের শেষ সীমায় রয়েছেন। আল্লাহ বলবেন, আমি নিশ্চয় কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। এরপর গায়েব থেকে আওয়াজ আসবে, (অন্যান্য রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ নিজেই ডেকে বলবেন,) হে ইবরাহিম, তোমার পায়ের নিচে তাকাও, কী দেখা যাচ্ছে? হযরত ইবরাহিম আ. দেখবেন, ময়লায়-তলানো কবরের লাশখেকো একটি বিড়াল পায়ের ওপর লুটাচ্ছে। ফেরেশতারা সেটার পায়ে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

কিয়ামতের দিন আযারে কী অবস্থা হবে, সংক্ষিপ্ত হাদিসটিতে সেই ছবি অঙ্কিত হয়েছে। তা অবিকল কুরআনের সূরা আবাসা এবং সেই

আয়াগুলোর তাফসির, যাতে কিয়ামতের দিন কাফেরদের এমন অবস্থা বর্ণিত হয়েছে—

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ () تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ () أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (سورة عبس)

'এবং অনেক মুখমণ্ডল সেই দিন হবে ধূলিধূসর, সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা। এরাই কাফের ও পাপাচারী।' [সুরা আবাসা : আয়াত ৪০-৪২]

আর সুরা ইউনুসে মুমিন ও জান্নাতবাসীদের ক্ষেত্রে এমন অবস্থা হবে না বলে বলা হয়েছে—

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (سورة يونس)

'যারা মঙ্গলকর কাজ করে তাদের জন্য আছে মঙ্গল এবং আরো অধিক। কালিম ও হীনতা তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। [সুরা ইউনুস : আয়াত ২৬]

দীর্ঘ হাদিসটিতে দুটি নতুন কথা বলা হয়েছে। একটি কথা হলো, হযরত ইবরাহিম আ. আযারের এই অবস্থা দেখে আল্লাহ তাআলার দরবারে ওই দোয়া করবেন, যা আম্বিয়া আলাইহিস সালাম-এর দোয়াসমূহের মতো কবুল হয়েছিলো এবং এর অর্থ এই হবে যে, পিতার অপমান প্রকৃতপক্ষে আমারই অপমান। দ্বিতীয় কথা হলো, আল্লাহপাক আযারকে মৃত ব্যক্তির লাশখেকো বিড়ালের আকৃতিতে রূপান্তর করে দেবেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. এই হাদিসের অংশগুলোর ওপর আলোচনা করে বলেছেন, আল্লাহপাক আযারের আকৃতি এইজন্য পরিবর্তন করে দেবেন, যাতে আযারকে মানুষের আকৃতিতে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে দেখলে হযরত ইবরাহিম আ.-এর অন্তরে যে-দুঃখ ও কষ্ট হতো তা না হয়। আর তিনি তার এমন বিভৎস-কুৎসিত রূপ দেখে তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন এবং তাঁর স্বভাব সেটার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। আর আযারকে মড়াখেকো বিড়ালের আকারে রূপান্তরিত করার এই কারণ বর্ণনা করেছন যে, প্রাণীতত্ত্ববিদদের মতে উল্লিখিত বিড়াল আবর্জনায় তলানোও আবার হিংস্র জন্তুদের মধ্যে সবচেয়ে নির্বোধও। আযার মূর্তিপূজক হওয়ায় অপত্রিতার আবর্জনার মধ্যে নিমজ্জিত ছিলো এবং হযরত ইবরাহিম আ.-এর পেশকৃত দলিল প্রমাণ এবং আল্লাহর

একত্বের উজ্জ্বল প্রমাণসমূহ স্বীকার না করার নির্বোধও ছিলো। তাই আল্লাহ তাআলার বিধান 'কর্মফল দেয়া হবে সেই জাতীয় কর্ম দ্বারা'-এর প্রতি লক্ষ করে আযার এরই উপযুক্ত ছিলো যে সে একটি অপবিত্র এবং নির্বোধ হিংস্র জন্তুর আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

কিন্তু বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইসমাইল এই রেওয়ায়েতটিকে ত্রুটিযুক্ত এবং ভর্ৎসনার উপযোগী মনে করেন এবং সনদের বিশুদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও রাবির জ্ঞানবুদ্ধির দুর্বলতার কারণে তা গ্রহণ করেন না। তিনি বলেন :

এই হাদিসে এই দুর্বলতা রয়েছে যে, এতে হযরত ইবরাহিম আ.-এর ওপর (নাউযুবিল্লাহ) এই দোষ আসে যে, তিনি আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে ওয়াদা খেলাফ করার সন্দেহ করছেন। সে-কারণেই তো এ-ধরনের প্রশ্ন করছেন। অথচ হযরত ইবরাহিম আ. অতি উচ্চ স্তরের আম্বিয়ায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত। তিনি নিঃসন্দেহে জানতেন, আল্লাহ কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন না।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (سورة آل عمران)

'নিশ্চয় আল্লাহ ওয়াদার খেলাফ করেন না।' [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৩]

সুতরাং, ইবরাহিম আ.-এর দিকে এ-ধরনের কথার সম্পর্ক আরোপ করা নিশ্চিতভাবেই ঠিক নয়। তিনি আযারের শিরকি জীবন এবং মৃত্যুর বিষয় অবগত থেকে কোনোক্রমেই এ-ধরনের প্রার্থনা করতে পারেন না।

ইসমাইল ছাড়াও অন্য মুহাম্মদিসগণও এই দীর্ঘ রেওয়ায়েতটির বিষয়ে সমালোচনা করেছেন। তাঁরা বলেন, এই রেওয়ায়েতটি বাহ্যত কুরআনের খেলাফ। কেননা, আল্লাহপাক সুরা তওবায় হযরত ইবরাহিম আ. সম্পর্কে বলেছেন—

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (سورة التوبة)

'ইবরাহিম তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলো, তাকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো বলে; (তিনি মাগফেরাত কামনার ব্যাপারে তাঁর পিতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।) এরপর যখন ইহা তার কাছে (ওহির মাধ্যমে) স্পষ্ট হলো যে, সে আল্লাহর শত্রু (অর্থাৎ পরিণামেও সে কাফেরই থাকবে) তখন ইবরাহিম তার সম্পর্ক ছিন্ন করলো। (সম্পর্কহীনতার ঘোষণা করে দিলেন।) ইবরাহিম তো কোমল-হৃদয়, সহনশীল। [সুরা তাওবা : আয়াত ১১৪]

এ-আয়াতটি এ-কথা ব্যক্ত করছে যে, হযরত ইবরাহিম আ. দুনিয়াতেই জানতে পেরেছিলেন, তাঁর পিতার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহর শত্রুই ছিলেন এবং এই শত্রুতার ওপরই তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো। তাই তিনি দুনিয়াতেই তার নিজের অসন্তোষ এবং সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন এবং বলে দিয়েছিলেন, আল্লাহর শত্রুর সঙ্গে আল্লাহর বন্ধুর কোনো ধরনের সম্পর্ক থাকতে পারে না। তাহলে, এই অবস্থার পর রেওয়ায়েতটির এই বিষয়বস্তু কেমন করে শুদ্ধ হতে পারে?

ইবনে হাজার আসকালানি উপরিউক্ত দুই ধরনের সমালোচনা উদ্ধৃত করার পর সেগুলোর জবাব দিচ্ছেন এভাবে :

হযরত ইবরাহিম আ. তাঁর পিতার প্রতি কখন অসন্তুষ্টি ও নিঃসম্পর্কতা ঘোষণা করেছিলেন—এ-প্রসঙ্গে দুটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে । ১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে জারির রা. বিশুদ্ধ সনদের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন, যখন কুফর ও শিরকের অবস্থায় আযারের মৃত্যুর হয়ে গেলো, তখন হযরত ইবরাহিম আ.-এর নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মালো যে, আযার আল্লাহর শত্রুরূপে মৃত্যুবরণ করেছে। তাই তিনি আযারের সঙ্গে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার যে-ওয়াদা করেছিলেন তা ত্যাগ করলেন এবং তার প্রতি অসন্তুষ্টি ও সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করে দিলেন। ২. এই রেওয়ায়েতও ইবনে জারির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আযারের প্রতি হযরত ইবরাহিম আ.-এর অসন্তোষ এবং নিঃসম্পর্কতা ঘোষণা করার বিষয়টি দুনিয়াতে নয়, কিয়ামতের দিন ঘটবে। আর তা এভাবে ঘটবে যেমন পূব-উল্লিখিত রেওয়ায়েতটিতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, যখন আযারের আকৃতি পরিবর্তন করে মড়াখেকো বিড়ালে পরিণত করা হলো, তখন হযরত ইবরাহিম আ. দৃঢ় বিশ্বাস করলেন যে, এখন আর পিতার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করার অবকাশ মোটেই বাকি নেই।

ত্রুটি আলোচনা ও সমালোচনা প্রতি লক্ষ্য রেখে রেওয়ায়েত দুটির মধ্যে ঐক্য রক্ষা করার উপায় এই যে, ইবরাহিম আ. যদিও দুনিয়াতেই আযারের শিরকি মৃত্যু দেখে তার প্রতি অসন্তুষ্টি ও সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু যখন কিয়ামতের ময়দানে পিতার করুণ অবস্থা দেখবেন, তখন তার দয়া-গুণটি উথলে উঠবে এবং প্রাকৃতিক তাড়নাতেই তিনি মাগাফেরাত কামনার দিকে অগ্রসর হবেন। পরে আল্লাহপাক আযারকে বিড়ালে রূপান্তরিত করে দিলে ইবরাহিম আ. তার

পরিণাম সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়বেন এবং বুঝতে পারবেন যে, নিশ্চিতভাবেই তার মাগফেরাতের কোনো উপায় নেই। তাই সেই পাকড়াও করার দিনেও দ্বিতীয়বার সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করে দেবেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানির এই জবাবের সারমর্ম এই যে, কুরআন মাজিদ হযরত ইবরাহিম আ.-এর বিশেষ বিশেষ গুণাবলির মধ্যে এই গুণটিরও উল্লেখ করেছে যে, إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (ইবরাহিম কোমল-হৃদয়, দয়ার্দ্র)। এই গুণটির বিভিন্ন প্রকাশস্থলের মধ্যে একটি হলো আযারের মৃত্যু শিরক ও কুফরের ওপর হওয়া এবং দুনিয়াতেই তার প্রতি ইবরাহিম আ.-এর অসন্তুষ্টি এবং সম্পর্কহীনতার ঘোষণা সত্ত্বেও (যার উল্লেখ কুরআনের সুরা তওবার মধ্যে বিদ্যমান) যখন তিনি কিয়ামতের দিন আযারকে আযাবের এই দুরবস্থায় দেখবেন (عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ/ অনেক মুখমণ্ডল সেই দিন হবে ধূলিধূসর, সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা), তাঁর দয়া ও করুণা উথলে উঠবে এবং এই উচ্চ স্তরের নবীদের মতো প্রকৃত অবস্থা অবগত থেকেও তাঁর প্রকৃতগত স্বভাব এ-পর্যায়ে এসে পৌঁছবে যে তিনি আযারের জন্য মাগফেরাত কামনা করতে উদ্যত হয়ে উঠবেন। যখন দেখবেন যে, আযারের শিরকি জীবনের কোনো একটি শাখা বা অবস্থাকেও তাঁর জন্য সুপারিশ করার উসিলারূপে গ্রহণ করা যাচ্ছে না, তখন তাঁর নিজের সেই দোয়াটির আশ্রয় গ্রহণ করবেন, যা দুনিয়াতেই চিরকালের জন্য কবুল হয়েছিলো। পিতার অপমানকে নিজের অপমানরূপে প্রকাশ করে আল্লাহর দরবারে সেই ওয়াদাটির কথা উল্লেখ করবেন। কিন্তু আল্লাহ এর উত্তরে 'আমি কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি' বলে হযরত ইবরাহিম আ.-এর মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করবেন যে, নিজের এই স্বভাবগত দয়া ও করুণা সত্ত্বেও তোমার এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, এটা আমলের দুনিয়া নয়; বরং এটা কর্মফলের দিন এবং ইনসাফের পাল্লা প্রতিষ্ঠিত। এর জন্য আমার অপরিবর্তনীয় বিধি-নিয়ম চিরতরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, 'কাফের ও মুশরিকদের জন্য জান্নাতে কোনো স্থান নেই।' আর বিষয় এই যে, কাফেরদের অপমান কখনো মুমিনদের জন্য অপমানের কারণ হতে পারে না। তাদের উভয়ের মধ্যে দুনিয়ার সম্পর্কের বন্ধন যত দৃঢ়ই থাকুক না কেনো। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর হেকমত এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দেবে যে হযরত ইবরাহিম আ.-এর ওপর দুশ্চিন্তা

ও দুঃখের কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট থাকবে না। যে-কারণে তাঁর স্বভাবগত আবেগপ্রবণতা তাঁকে মাগফেরাতের দোয়া করার জন্য প্রস্তুত করেছিলো। যেমন, আযারকে হিংস্র বিড়ালের আকৃতিতে রূপান্তরিত করা হবে। যে-কারণে হযরত ইবরাহিম আ.-এর পবিত্র ও সুস্থ প্রকৃতি তা দেখে ঘৃণা করতে থাকবে।

সারকথা, হযরত ইরাহিম আ.-এর এই প্রার্থনা এজন্য ছিলো না যে, (নাউযুবিল্লাহ) তিনি আযারের সেই অবস্থাকে আল্লাহর ওয়াদার খেলাফ মনে করছেন। বরং তাঁর প্রাকৃতিক ও স্বভাবগত আবেগ ও তাড়নার কারণে এই প্রার্থনা করেছিলেন। যদিও তা পরিণামফলকে পরিবর্তন করতে পারতো না, কিন্তু তা অবশ্যই সেই মহান ব্যক্তিত্বের সৎ উদ্দীপনা ও দয়াগুণকে উজ্জ্বলতর করার কারণ।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানির এই জবাব ইসমাইল ও অন্য মুহাদ্দিসিনে কেরামের সমালোচনাকে নিঃসন্দেহে বিশেষভাবে হালকা করে দিয়েছে। তারপরও এটা স্বীকার করতেই হবে যে, হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত সহিহ বুখারির সংক্ষিপ্ত হাদিসটি ব্যতীত অন্য দীর্ঘ হাদিসটির কোনো কোনো অংশ অবশ্য লক্ষ্যণীয়। হাফেজে হাদিস ইমাদুদ্দিন বিন কাসির সম্ভবত এই রেওয়ায়েতগুলোকে তাঁর তাফসিরের কিতাবে বর্ণনা করার পর সংক্ষিপ্ত হাদিসটিকে গ্রহণ করে সহিহ বুখারির কিতাবুল আম্বিয়াতে উদ্ধৃত দীর্ঘ হাদিসটির ওপর তাফাররুদ বা নিঃসঙ্গতার এবং সুনানে নাসায়ির হাদিসটির ওপর গরিব (অপরিচিত) ও মুনকার (অস্বীকৃত) হওয়ার ত্রুটি আরোপ করছেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস কিরমানিও এ-বিষয়টিকে প্রশ্ন ও উত্তরের আকাশে পেশ করে তার সমাধান করার চেষ্টা করেছেন। তা যথাস্থানে প্রণিধানযোগ্য।[৩০]

---

[৩০] ফাতহুল বারি : অষ্টম খণ্ড, কিতাবুল আম্বিয়া।

হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম

হযরত ইসমাইল আ.-এর জন্ম

হযরত ইবরাহিম আ. তখন পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর বাসগৃহের মালিক এক বাঁদির গর্ভজাত গোলাম আল-ইয়ারায দিমাশকি। একদিন হযরত ইবরাহিম আ. একটি সন্তানের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। এই মর্মে তাওরাতে বর্ণিত আছে :

"ইবরাহিম বললেন, হে খোদা, আপনি কি আমাকে দান করবেন। আমি তো সন্তানহীন জীবন কাটাচ্ছি। আমার গৃহের মালিক আল-ইয়ারায। এরপর একদিন ইবরাহিম বললেন, আপনি আমাকে সন্তান দিলেন না, দেখুন, আমার বাঁদির গর্ভজাত গোলাম আমার উত্তরাধিকারী হবে। তখন তাঁর ওপর আল্লাহর বাণি নাযিল হলো। আল্লাহ বললেন, এই গোলাম তোমার উত্তরাধিকারী হবে না; বরং যে-সন্তান তোমার ঔরস থেকে জন্মগ্রহণ করবে সে-ই তোমার উত্তরাধিকারী হবে।"

এই প্রার্থনা এইভাবে কবুল হলো যে, হযরত ইবরাহিম আ.-এর দ্বিতীয় স্ত্রী হযরত হাজেরা রা. গর্ভবতী হলেন। যেমন তাওরাতে উল্লেখ করা হয়েছে :

"আর (উল্লিখিত প্রার্থনার পর) তিনি হাজেরার নিকট গেলেন এবং তিনি (হাজেরা) গর্ভধারণ করলেন।"[৩১]

হযরত সারা রা. যখন এটা জানতে পারলেন, তিনি মনুষসুলভ স্বভাব ও প্রকৃতির তাড়নায় হযরত হাজেরার প্রতি ঈর্ষান্বিত হলেন। তিনি হযরত হাজেরাকে নানা প্রকারে উত্ত্যক্ত করতে লাগলেন। হযরত হাজেরা বাধ্য হয়ে তাঁর কাছ থেকে চলে গেলেন। এই ঘটনা সম্পর্কে তাওরাত বলছে :

"আর আল্লাহর ফেরেশতারা তাঁকে (হযরত হাজেরাকে) প্রান্তরে পানির এক ঝরনার কাছে পেলেন। এটি সেই ঝরনা যা 'ছুররে' পথের পাশে অবস্থিত। ফেরেশতারা বললেন, হে সারার খেদমতগার হাজেরা, তুমি এখানে কোথা থেকে এলে? তুমি কোন দিকে যাচ্ছো? হাজেরা বললেন, আমি বিবি সারার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি। আল্লাহর ফেরেশতারা বললেন, তুমি বিবি সারার কাছে ফিরে যাও এবং তাঁর আনুগত্য করো ও খেদমতগার থাকো। এরপর আল্লাহর ফেরেশতা বললেন, আমি তোমার

---

[৩১] তাওরাত : আবির্ভাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৫, আয়াত ২-৪।

সন্তান অনেক বেশি বাড়িয়ে দেবো। এমনকি সংখ্যাধিক্যের কারণে তাদের গণনাও করা যাবে না। আল্লাহর ফেরেশতা আরো বললেন, তুমি গর্ভবতী। তুমি একটি পুত্র সন্তান জন্মদান করবে। তার নাম রেখো ইসমাইল। আল্লাহ তাআলা তোমার দুঃখ-কষ্টের কথা শুনেছেন। তোমার সেই পুত্রটি হবে যাযাবর শ্রেণির লোক। তার হাত হবে সবার বিরোধী এবং তার বিরোধী হবে সবার হাত। সে তার সব ভাইয়ের সামনে বসবাস করবে।"[৩২]

হযরত হাজেরা রা. সেই স্থানে ফেরেশতাদের সঙ্গে কথোপকথন করলেন। সেই স্থানে একটি কূপ ছিলো। হযরত হাজেরা স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ সেই কূপটির নাম রাখলেন 'জীবদ্দশায় দৃষ্ট ব্যক্তির কূপ'। কিছুকাল পরেই হযরত হাজের পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন। ফেরেশতাদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তাঁর নাম রাখা হলো ইসমাইল।

"আর হাজেরা ইবরাহিমের জন্য পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। ইবরাহিম হাজেরাপ্রসূত সেই পুত্রের নাম রাখলেন ইসমাঈল। আর যখন হাজেরার গর্ভ থেকে তাঁর পুত্র ইসমাইল জন্মগ্রহণ করলেন, তখন ইবরাহিমের বয়স ছিলো ৮৬ বছর।"[৩৩]

আল্লাহপাক ইসমাইলের পর হযরত ইবরাহিম আ.-কে ইসহাকের সুসংবাদ প্রদান করলেন। কিছুটা পরেই তার বিস্তারিত বিবরণ আসবে। কিন্তু ইবরাহিম আ. সেই সুসংবাদের জন্য খুব বেশি আনন্দ প্রকাশ করলেন না। তার পরিবর্তে তিনি এই প্রার্থনা করলেন :

"আর ইবরাহিম আল্লাহর দরবারে এই প্রার্থনা জানালেন, আমি আশা করি, ইসমাইল যেনো তোমার কাছে জীবিত থাকে।"[৩৪]

আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম আ.-এর প্রার্থনার জবাব দিলেন :

"ইসমাইল সম্পর্কে আমি তোমার প্রার্থনা শুনলাম। দেখো, আমি তাকে বরকত দান করবো। তার সন্তান হবে অনেক। তাকে অনেক বেশি বাড়িয়ে দেবো এবং তার বংশে বারোজন সরদার জন্মলাভ করবে। আর আমি তাকে এক বিরাট সম্প্রদায়ে পরিণত করবো।[৩৫]

---

[৩২] তাওরাত : আবির্ভাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৬, আয়াত ৭, ১২।
[৩৩] তাওরাত : আবির্ভাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৬, আয়াত ১৫, ১৬।
[৩৪] তাওরাত : আবির্ভাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৭, আয়াত ১৮।
[৩৫] তাওরাত : আবির্ভাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৭, আয়াত ২০।

اسماعیل শব্দটি اسمع এবং ایل শব্দ দুটির সমন্বয়ে গঠিত একটি যুক্ত শব্দ। হিব্রু ভাষায় ایل শব্দের অর্থ 'আল্লাহ'। আরবি اسمع এবং হিব্রু شماع শব্দের একই অর্থ : শুনো। যেহেতু হযরত ইসমাইল আ.-এর জন্মের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহিম আ.-এর দোয়া শুনেছিলেন এবং হরযত হাজেরা রা. ফেরেশতার মাধ্যমে সুসংবাদ পেয়েছিলেন, তাই তাঁর এই নাম রাখা হয়েছিলো। হিব্রু ভাষায় এর উচ্চারণ شماع ایل (শিমা'ইল)।

শস্য-শ্যামলিমাহীন প্রান্তর এবং হাজেরা ও ইসমাইল

হযরত হাজেরার গর্ভ থেকে হযরত ইসমাইল আ.-এর জন্মগ্রহণ করা হযরত সারার জন্য অত্যন্ত মনঃপীড়াদায়ক হলো। হযরত ইবরাহিম আ. প্রথম ও বড় স্ত্রী আগে থেকেই গৃহের কর্ত্রী ছিলেন। আর হাজেরা হলেন ইবরাহিম আ.-এর ছোট স্ত্রী এবং সারার খেদমতগার। এসব কারণে মানবিক স্বভাবের তাড়নায় ইসমাইল আ.-এর জন্মগ্রহণ হযরত সারার জন্য প্রাণঘাতী হয়ে দাঁড়ালো। ফলে হযরত সারা হযরত ইবরাহিম আ.-এর কাছে জিদ করে বসলেন, হাজেরা ও তার শিশুপুত্র আমার চোখের সামনে যেনো না থাকে। তাদেরকে ভিন্ন কোনো স্থানে নিয়ে যাওয়া হোক।

এই জিদ হযরত ইবরাহিম আ.-এর কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয় মনে হলো। কিন্তু আল্লাহপাক তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, হাজেরা, ইসমাইল ও তোমার জন্য এতেই কল্যাণ যে সারার কথা মেনে নাও।

'আর সারা দেখলেন যে, মিসর দেশীয় হাজেরার পুত্র, যা সে ইবরাহিমের ঔরস থেকে প্রসব করেছে, খিল খিল করে হাসছে, তখন তিনি ইবরাহিম আ.-কে বললেন, এই বাঁদির পুত্র আমার পুত্র ইসহাকের সঙ্গে ওয়ারিস হবে না। নিজের পুত্রের উদ্দেশে এ-ধরনের উক্তি হযরত ইবরাহিম আ.-এর কাছে খুবই খারাপ মনে হলো। আল্লাহ ইবরাহিম আ.-কে বললেন, তোমার পুত্র ও তোমার বাঁদি সম্পর্কে সারার ওই উক্তিটি যেনো তোমার খারাপ মনে না হয়। সারা তোমাকে যা বলেছে তার প্রতিটি কথার আওয়াজের প্রতি কর্ণপাত করো। কারণ তোমার বংশ ইসহাক থেকেই

তাঁদেরকে রেখে গেলেন। স্থানটি তখন অনাবাদ ও জনমানবহীন বিরান ছিলো। পানিরও নামগন্ধ পর্যন্ত ছিলো না। তাই হযরত ইবরাহিম আ. এক মশক পানি ও এক থলে খেজুর তাঁদের কাছে রেখে গেলেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রওয়ানা হলেন। হযরত হাজেরা রা. তাঁর পেছনে পেছনে এ-কথা বলতে বলতে চললেন, হে ইবরাহিম, আপনি আমাদেরকে এই উপত্যকায় কোথায় ছেড়ে চলে যাচ্ছেন? এখানে কোনো মানুষও নেই, কোনো সহায়ও নেই, দুঃখ-কষ্টের কোনো সঙ্গীও নেই। হাজেরা রা. অনবরত এসব কথা বলে চললেন; কিন্তু ইবরাহিম আ. নীরবেই চলে যাচ্ছিলেন। অবশেষে হযরত হাজেরা রা. জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার রবই কি আপনাকে এমন আদেশ করেছেন?" তখন ইবরাহিম আ. বললেন, "হ্যাঁ, তা আমার রবের আদেশেই হয়েছে।" এ-কথা শুনে হাজেরা বললেন, "া যদি আল্লাহরই হুকুম হয়ে থাকে তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি আমাদেরকে ধ্বংস ও বরবাদ করবেন না। এরপর তিনি ফিরে এলেন। হযরত ইবরাহিম আ. চলতে চলতে একটি টিলার ওপর এমন স্থানে পৌঁছলেন যে তাঁর পরিবারবর্গ (হযরত হাজেরা রা. ও হযরত ইসমাইল আ.) তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তখন তিনি বর্তমান কা'বাগৃহের তৎকালীন শূন্যস্থানের দিকে মুখ করে এবং দুই হাত তুলে এই দোয়া করলেন—

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (سورة إبراهيم)

"হে আমার প্রতিপালক, (আপনি দেখছেন যে,) আমি আমার বংশধরদের কতিপয়কে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় (যেখানে খেত-কৃষ্টির নামচিহ্নও নেই) তোমার পবিত্র গৃহের কাছে, হে আমার প্রতিপালক, এইজন্য যে, তারা যেনো সালাত কায়েম করে (যেনো এই সম্মানিত ঘরটি তাওহিদের উপাসনাকারীদের থেকে শূন্য না থাকে)। অতএব তুমি (নিজ অনুগ্রহ ও দয়ায়) কিছু মানুষের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলাদি দিয়ে (জমিন থেকে উৎপন্ন শস্যাদির মাধ্যমে) তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করো, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।" [সুরা ইবরাহিম : আয়াত ৩৭]

হাজেরা কয়েকদিন পর্যন্ত মশক থেকে পানি এবং থলে থেকে খেজুর খেতে থাকলেন এবং শিশুপুত্র ইসমাইলকে দুধ পান করালেন। অবশেষে এমন সময় এলো যখন পানিও থাকলো, খেজুরও থাকলো না। তখন তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। যেহেতু তিনি তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত ছিলেন, তাই তার বুকের দুধও শুকিয়ে গিয়েছিলো। ফলে শিশু ইসমাইলও তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত থাকলো। অবস্থা যখন অন্যদিকে মোড় নিতে শুরু করলো এবং শিশু ইসমাইল অস্থির হয়ে পড়লো, তখন হাজেরা রা. ইসমাইলকে রেখে দূরে গিয়ে বসলেন। যেনো এমন নিদারুণ সময়ে প্রাণতুল্য পুত্রের মুমূর্ষু দশা নিজের চোখে দেখতে না হয়। কিছু একটা ভেবে তিনি নিকটবর্তী সাফা পাহাড়ের ওপর আরোহণ করলেন। হয়তো আল্লাহর কোনো বান্দাকে দেখতে পাবেন অথবা পানি দেখতে; কিন্তু তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না। এরপর শিশুপুত্রের ভালোবাসায় অস্থির হয়ে দৌড়ে তার কাছে এলেন, আবার অপরদিকে নিকটবর্তী পাহাড় মারওয়ার ওপর আরোহণ করলেন। ওখানেও যখন কিছুই দেখতে পেলেন না; আবারো দৌড়ে উপত্যকায় শিশুপুত্রের কাছে চলে এলেন। এভাবে সাতবার এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে দৌড়ালেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই জায়গায় পৌঁছে বললেন, “এটাই সেই ‘সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থলের দৌড় (সায়ি)’ যা হজের সময় হাজিরা করে থাকে।” সর্বশেষ যখন হযরত হাজেরা মারওয়া পাহাড়ের উপরে ছিলেন, তখন তাঁর কানে একটি আওয়াজ এলো। তিনি চমকে উঠলেন এবং মনে মনে ভাবলেন, কেউ ডাকছে। কান পাতলেন, আবারো সেই আওয়াজ শুনলেন। হাজেরা বললেন, “যদি তুমি কিছু সাহায্য করতে পারো তবে সামনে আসো। আমি তোমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।” এরপর তিনি দেখলেন আল্লাহর ফেরেশতা হযরত জিবরাইল আ.। ফেরেশতা তাঁর পায়ের গোড়ালি দিয়ে সেই স্থানে আঘাত করলেন, যেখানে বর্তমানে যমযম কূপ রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থান থেকে পানি উথলে উঠলে লাগলো। হযরত হাজেরা রা. তা দেখে পানির চারদিকে বাঁধ বাঁধতে লাগলেন; কিন্তু পানি উথলে উঠতেই থাকলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই জায়গায় পৌঁছে বললেন, “আল্লাহ তাআলা ইসমাইলের মাতার প্রতি রহম করুন, যদি তিনি যমযমকে এভাবে না রুখতেন এবং তার চারপাশে বাঁধ না বাঁধতেন তাহলে আজকে তা এক মহা শক্তিশালী

ঝরনায় পরিণত হতো।" হযরত হাজেরা পানি পান করলেন এবং তারপর ইসমাইলকে দুধ পান করালেন। ফেরেশতা হযরত হাজেরাকে বললেন, দুশ্চিন্তা ও ভয় করো না। আল্লাহ তোমাকে এবং তোমার এই শিশুপুত্রকে ধ্বংস করবেন না। এটা বাইতুল্লাহ শরিফের স্থান। তা নির্মাণ করার দায়িত্ব এই শিশু ও তাঁর পিতা হযরত ইবরাহিম আ.-এর অদৃষ্টে নির্ধারিত হয়েছে। এ-কারণে আল্লাহ এই বংশকে ধ্বংস করবেন না। বাইতুল্লাহর সেই স্থানটি কাছেই দেখা যাচ্ছিলো; কিন্তু পানির স্রোত ডান দিকের ও বাম দিকের সেই অংশকে বরাবর করে যাচ্ছিলো।

সে-সময়েই বনি জুরহামের একটি গোত্র ওই উপত্যকার কাছে এসে থামলো। তারা দেখলে কিছুটা দূরেই পাখি উড়ছে। জুরহাম গোত্রের লোকেরা বললো, এটা পানির লক্ষণ। ওখানে অবশ্যই পানি আছে। জুরহামিরা এসে হযরত হাজেরার কাছে ওই স্থানের বসবাস করার অনুমতি প্রার্থনা করলো। হযরত হাজেরা বললেন, অবস্থান করতে পারো, তবে পানিতে মালিকানাস্বত্বের অংশীদার হতে পারবে না। জুরহামিরা আনন্দের সঙ্গে তা মেনে নিলো এবং ওখানেই বসবাস করতে শুরু করলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হাজেরা নিজেও পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সঙ্গলাভ করতে চাচ্ছিলেন। কেউ যেনো ওখানে এসে বসবাস করে। তাই তিনি আনন্দের সঙ্গে বনি জুরহামকে ওখানে বসবাস করার অনুমতি দিলেন। জুরহামিরা লোক পাঠিয়ে নিজ নিজ বংশের অবশিষ্ট লোকরদেরকে ওখানে নিয়ে এলো। তারা ওখানে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করতে লাগলো। এদের মধ্যেই হযরত ইসমাইল আ. থাকতেন এবং খেলাধুলা করতেন। জুরহামি লোকদের থেকে তাদের ভাষা শিখতেন। ইসমাইল আ. বড় হয়ে উঠলে তাঁর চাল-চলন এবং তাঁর সৌন্দর্য ও কান্তি জুরহামিদের খুব পছন্দ হলো। তারা নিজ বংশের এক কন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে করিয়ে দিলো। এর কিছুকাল পরেই হযরত হাজেরা রা.-এর ইন্তেকাল হলো। হযরত ইবরাহিম আ. প্রায়শই তাঁর পরিবারকে দেখার জন্য ওখানে আসতেন। তিনি একবার ওখানে এলেন। তখন ইসমাইল আ. ঘরে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, জীবিকার অন্বেষণে বাইরে গেছেন। ইবরাহিম আ. জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের দিনকাল চলছে কীভাবে? ইসমাইলের স্ত্রী বললেন, খুব বিপদ-আপদ ও অস্থিরতার মধ্য দিয়ে

চলছে এবং আমরা অত্যন্ত দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে আছি। ইবরাহিম আ. এসব কথা শুনে বললেন, ইসমাইলকে আমার সালাম বলো এবং তাঁকে বলো, তোমার দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করে ফেলো। ইসমাইল আ. ঘরে ফিরে এসে ইবরাহিম আ.-এর নবুওতের নুরের আভাস পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেউ এসেছিলেন কি? তাঁর স্ত্রী সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন এবং ইবরাহিম আ.-এর নির্দেশও শোনালেন। ইসমাইল আ. তিনি আমার পিতা ইবরাহিম ছিলেন। তাঁর পরামর্শ হলো আমি যেনো তোমাকে তালাক প্রদান করি। সুতরাং আমি তোমাকে বিবাহ-বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলাম।

ইসমাইল আ. এরপর দ্বিতীয় বিয়ে করলেন। আবার একদিন ইবরাহিম আ. ইসমাইল আ.-এর অনুপস্থিতিতে তাঁর ঘরে তাশরিফ আনলেন এবং আগের মতোই তাঁর স্ত্রীকে জীবনজীবিকার কথা জিজ্ঞেস করলেন। ইসমাইল আ.-এর স্ত্রী বললেন, আল্লাহপাকের শুকরিয়া, আমাদের দিনতিপাত ভালোই চলছে। ইবরাহিম আ. জিজ্ঞেস করলেন, খাও কী? ইসমাইল আ.-এর স্ত্রী বললেন, গোশত। ইবরাহিম আ. জিজ্ঞেস করলেন, পান করো কী? ইসমাইল আ.-এর স্ত্রী বললেন, পানি। ইবরাহিম আ. দোয়া করলেন, হে আল্লাহ, তাদের গোশত ও পানিতে বরকত দান করো। এরপর বিদায়বেলায় নির্দেশ দিয়ে গেলেন, তোমার স্বামীকে বলো, সে যোনো তার গৃহের চৌকাঠ সংরক্ষিত রাখে। হযরত ইসমাইল আ. ঘরে ফিরে এলে তাঁর স্ত্রী যাবতীয় ঘটনা শোনালেন এবং ইবরাহিম আ.-এর নির্দেশের কথাও বললেন। ইসমাইল আ. বললেন, ইনি আমার পিতা ইবরাহিম আ.। তাঁর নির্দেশ এই যে, তুমিই যেনো গোটা জীবন আমার জীবনসঙ্গিনী থাকো।

এই দীর্ঘ হাদিসটি সহিহ বুখারির কিতাবুল রু'ইয়া (স্বপ্ন অধ্যায়) এবং কিতাবুল আম্বিয়া (নবীগণ অধ্যায়) দু-জায়গাতেই উদ্ধৃত করা হয়েছে। রেওয়ায়েত দুটি থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইসমাইল আ. কৃষি-ফসলহীন উপত্যকায় অর্থাৎ মক্কায় স্তন্যপায়ী অবস্থায় পৌছে ছিলেন।

কিন্তু সাইয়িদ সুলাইমান নদবি তাঁর 'আরদুর কুরআন' গ্রন্থে তাওরাতের রেওয়ায়েত খণ্ডন বা তার শুদ্ধিকরণে এ-কথা লিখেছেন যে, হযরত

ইসমাইল আ. জ্ঞান-বুদ্ধির বয়সে পৌঁছেছিলেন। তিনি কুরআন মাজিদের নিম্নলিখিত আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করছেন—

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ () فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ () فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (سورة الصافات)

'"হে আমার প্রতিপালক, আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ (পুত্র) সন্তান দান করো।" সুতরাং আমি তাকে এক স্থিরবুদ্ধি (ধৈর্যশীল) পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। এরপর সে যখন তাঁর পিতার সঙ্গে কাজ করার (দৌড়ানোর) মতো বয়সে উপনীত হলো তখন ইবরাহিম বললো, "বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি জবাই করছি। এখন, তোমার অভিমত কী বলো?" সে বললো, "হে আমার পিতা, আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা-ই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।"' [সুরা আস-সাফফাত : আয়াত ১০০-১০২]

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ () وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (سورة الصافات)

'আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের, সে ছিলো এক নবী, সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। আমি তাকে বরকত দান করেছিলাম এবং ইসহাককেও; তাদের বংশধরদের মধ্যে কতিপয় সৎকর্মপরায়ণ এবং কতিপয় নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী।' [সুরা আস-সাফফাত : আয়াত ১১২-১১৩]

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ

"হে আমার প্রতিপালক, আমি আমার বংশধরদের কতিপয়কে বসবাস করালাম (খেত-খামারহীন) অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের কাছে।" [সুরা ইবরাহিম : আয়াত ৩৭]

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (سورة إبراهيم)

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাইল ও ইসহাককে দান করেছেন। আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রার্থনা শুনে থাকেন।" [সুরা ইবরাহিম : আয়াত ৩৯]

সাইয়িদ সুলাইমান নদবি উপরিউক্ত আয়াতগুলো থেকে এভাবে প্রমাণ গ্রহণ করেন যে, সুরা আস-সাফফাতের প্রথম আয়াতটিতে 'তার সঙ্গে দৌড়ানোর/কাজ করার বয়সে পৌছলো' কথা থেকে বুঝা যায় ইসমাইল আ. জ্ঞান-বুদ্ধির বয়সে উপনীত হওয়া পর্যন্ত হযরত ইবরাহিম আ.-এর সঙ্গে ছিলেন। আর শেষের আয়াতটি এ-কথা প্রমাণ করে যে, ইসহাক আ. তখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ইসমাইল আ. ইসহাক আ. থেকে ১৩ বছরের বড় ছিলেন। তা ছাড়া সুরা ইবরাহিমের আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায়, ইসমাইল আ.-কে যখন মক্কায় আনা হলো তখন তিনি জ্ঞান-বুদ্ধির বয়সে উপনীত হয়েছিলেন। এ-কারণেই তো ইবরাহিম আ. তাঁর দোয়ার মধ্যে দু-পুত্রের কথাই উল্লেখ করেছেন।

এই প্রমাণ গ্রহণের জন্য সাইয়িদ সুলাইমান নদবি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত সহিহ বুখারির হাদিসটিকে ইসরাইলি রেওয়ায়েত বলে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু সাইয়িদ সাহেবের এই দাবি সঠিক নয় এবং তাঁর পেশকৃত আয়াতগুলো দ্বারা তার সমর্থনও পাওয়া যায় না।

প্রথমত, এ-কারণে যে, সুরা আস-সাফফাতে فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ 'যখন তাঁর সঙ্গে কাজ করার/ দৌড়াবার বয়সে উপনীত হয়েছেন' কথার 'ইসমাইল আ. ইবরাহিম আ.-এর ছায়াতলে ফিলিস্তিনেই প্রতিপালিত হয়েছেন' অর্থ গ্রহণ করা তখনই শুদ্ধ হতে পারতো যদি এই বাক্যের পরে আয়াতের মধ্যে অন্যকোনো বাক্যে হযরত ইসমাইল আ.-এর মক্কায় পৌছা সম্পর্কে উল্লেখ করা না হতো। তাহলে হযরত ইসমাইল আ.-এর কুরবানির সঙ্গে সঠিক সম্বন্ধস্থাপন হতে পারতো। কেননা, ইসলামের সকল উলামায়ে কেরাম এ-বিষয়ে একমত এবং সাইয়িদ সুলাইমান সাহেবও এ-কথা মানেন যে, কুরবানির ঘটনাটি হযরত ইসমাইল আ.-এর মক্কার জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আর আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইসমাইল আ. যখন জ্ঞান-বুদ্ধির বয়সে উপনীত হলেন তখন তাঁর পিতা তাঁর কাছে নিজের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। সুতরাং সাইয়িদ সাহেবের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই আয়াতে বেশ গোলমাল পরিলক্ষিত হয়। অথচ এটা কুরআন মাজিদের বক্তব্য-পদ্ধতি ও বর্ণনা-রীতির সম্পূর্ণ বিপরীত যে, একই আয়াতের মধ্যে এমন গোলমাল সৃষ্টি করা, যাতে অতি গুরুত্বপূর্ণ দুটি জীবনের মধ্যে কোনো যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে।

দ্বিতয়ত, এ-কারণে যে, সুরা আস-সাফফাতের মধ্যে ইসমাইল আ. সম্পর্কে যে-ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে, তা 'যবহে আযিম' অর্থাৎ কুরবানির ঘটনা, মক্কায় পৌঁছার ঘটনা নয়। অবশ্য কুরবানির ঘটনাটি নিঃসন্দেহে ইসমাইল আ.-এর জ্ঞান-বুদ্ধির বয়সে উপনীত হওয়ার সময়কার ঘটনা এবং ইসহাক আ. তখন জন্মগ্রহণ করেছেন।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, হযরত ইবরাহিম আ. যদিও হাজের রা. ও ইসমাইল আ.-কে মক্কার মরুপ্রান্তরে ত্যাগ করে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি পিতা ছিলেন, নবী ছিলেন; কীভাবে তিনি স্ত্রী ও পুত্রকে ভুলে থাকতে পারতেন এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে কীভাবে বিমুখ হতে পারতেন? তিনি প্রায়শই ওই পানি ও তৃণহীন প্রান্তরে আসতেন এবং তাঁর পরিবারবর্গের দেখাশোনা করে থাকতেন। فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ আর আয়াতটির অর্থ এটাই। সুতরাং হযরত ইসহাক আ.-এর সুসংবাদের উল্লেখ সম্পূর্ণ যথাস্থানেই করা হয়েছে। সাইয়িদ সুলাইমান সাহেব নিজে তাওরাতের একটি আয়াতকে খণ্ডন করে বলছেন :

"তাওরাতে এ-কথার উল্লেখ নেই যে হযরত ইবরাহিম আ.-ও সঙ্গে এসেছিলেন। কিন্তু এমন হতভাগ্য কে আছে যে তার প্রিয় শিশুকে, যার জন্মের জন্য সে আল্লাহপাকের দরবারে দোয়া করেছে, আল্লাহর দরবারে যার জীবিত থাকার জন্য দোয়া করেছে, সেই স্নেহের শিশুকে নিঃসঙ্গ করে পানি ও তৃণতলাহীন মরুময় স্থানে চিরকালের জন্য যেতে দেবে?"

এমনিভাবে সুরা ইবরাহিম-এর আয়াতে عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ 'আপনার সম্মানিত ঘরের কাছে' কথাটির পরে এই বাক্য রয়েছে—

رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ

"হে আমার প্রতিপালক, এইজন্য যে, তারা যেনো সালাত কায়েম করে। অতএব তুমি কিছু মানুষের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও।" [সুরা ইবরাহিম : আয়াত ৩৭]

এ থেকে বোঝা যায়, হযরত ইবরাহিম আ.-এর এই দোয়া বাইতুল্লাহ শরিফ নির্মিত হওয়ার পরের ঘটনা। আর আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক স্পষ্টভাবে এটাকেই বুঝাচ্ছে। এই আয়াতে নামায কায়েম করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হজের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে এতে। এই আয়াতে এখানকার অধিবাসীদের জন্য রিযিকের সচ্ছলতার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ

পাচ্ছে। আর এসব বিষয়ের প্রার্থনা তখনই সমীচীন হতে পারে যখন বাইতুল্লাহ শরিফ পূর্ণ নির্মিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। অবশ্য আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের রেওয়ায়েতেও এই দোয়াটির উল্লেখ রয়েছে। তা থেকে বোঝা যায়, নিজের বংশধরকে এখানে রেখে যাওয়ার সময় হযরত ইবরাহিম আ. যে-দোয়া করেছিলেন, সেটাও এই দোয়ার কাছাকাছি ছিলো। এ-কারণে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর রেওয়ায়েতে প্রমাণস্বরূপ এই আয়াতটিকে উদ্ধৃত করে দেয়া হয়েছে। এই অর্থ এই নয়, এটাই অবিকল সেই দোয়া, যে-দোয়া ইবরাহিম আ. তখন করেছিলেন। আর তাতে হযরত ইসহাকেরও উল্লেখ ছিলো। যেখানে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা. নিজেই বর্ণনা করছেন যে, এই ঘটনা স্তন্যপানকালীন ঘটনা, সেখানে তিনি কীভাবে এ-কথা বলতে পারেন যে, ইবরাহিম আ. তখন এমন দোয়া করেছিলেন, যার শেষের দিকে হযরত ইসমাইলের সঙ্গে হযরত ইসহাকের জন্মেরও উল্লেখ রয়েছে?

তৃতীয়ত, এই অনবাদ ভূখণ্ডের প্রতিটি খণ্ডে ও আনাছে-কানাছে লবণাক্ত পানি ছাড়া মিঠা পানির নামগন্ধও নেই। আধুনিক যুগে নতুন নতুন যন্ত্রপাতির সাহায্য গ্রহণ করা সত্ত্বেও ওখানাকার মাটি থেকে মিঠা পানি বের করা অসম্ভব বিষয়ই থেকে গেছে। তবে যমযমের অস্তিত্ব ওখানে কেমন করে হলো? ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক দিক থেকে তা অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এ-সম্পর্কে কুরআন মাজিদের আয়াত কিছুই বলে না; কিন্তু সহিহ বুখারিতে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত এই দুটি হাদিস এই কূপটির অস্তিত্বের ইতিহাস বর্ণনা করছে। হাদিস দুটিতে হযরত ইসমাইল আ. তখন স্তন্যপায়ী শিশু ছিলেন বলে প্রকাশ পাচ্ছে। আর তাওরাতেও ওই ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা ওইসব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যা থেকে হযরত ইসমাইল আ. দুগ্ধপোষ্য শিশু বলে প্রকাশ পাচ্ছে।

যাইহোক। যদিও হযরত ইসমাইল আ. কোন্ বয়সে মক্কায় পৌঁছেছিলেন তা কুরআন মাজিদের কোনো আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় না, কিন্তু সহিহ বুখারির রেওয়ায়েতসমূহ বলে যে, সেই সময়টা ছিলো হযরত ইসমাইল আ.-এর মাতৃস্তন পানের সময়। আর এটাই সঠিক। সুতরাং হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদিসটি ইসরাইলি রেওয়ায়েতের

অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং ওহির ব্যাখ্যাকার হাদিসের বর্ণিত বিস্তারিত বিবরণই বিশুদ্ধ বর্ণনা।

কুরআন মাজিদ হযরত ইসমাইল আ.-এর জন্ম সম্পর্কে না নিয়ে কোনো কথা বলে নি। অবশ্য নাম উল্লেখ না করে তাঁর জন্মগ্রহণের সুসংবাদ বিদ্যমান রয়েছে।

হযরত ইবরাহিম আ. তখন নিঃসন্তান। তাই তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে একজন নেককার সন্তানের জন্য প্রার্থনা করছেন। আর আল্লাহ তাআলা তার প্রার্থনা মঞ্জুর করে সন্তান জন্মগ্রহণের সুসংবাদ দিচ্ছেন।

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ () فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (سورة الصافات)

'(ইবরাহিম আ. দোয়া করলেন,) "হে আমার প্রতিপালক, আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান করো।" সুতরাং আমি তাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।' [সুরা আস-সাফফাত : আয়াত ১০০-১০১]

কে এই ধৈর্যশীল পুত্র? তিনি সেই ইসমাইল যিনি হযরত হাজেরার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। কেননা, কুরআন মাজিদের এই আয়াতের পরবর্তী আয়াতে ইসহাক আ.-এর জন্মগ্রহণের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ () وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ (سورة الصافات)

'আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের (জন্মলাভের), সে ছিলো এক নবী, সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। আমি তাকে বরকত দান করেছিলাম এবং ইসহাককেও।' [সুরা আস-সাফফাত : আয়াত ১১২-১১৩]

সুতরাং হযরত ইবরাহিম আ.-এর দুই পুত্র ছিলেন—ইসহাক ও ইসমাইল। তাওরাত ও ইতিহাসের বর্ণনার ঐকমত্যের প্রেক্ষিতে ইসমাইল আ. বড় এবং ইসহাক ছোট। অতএব, পরিষ্কার প্রকাশ পাচ্ছে যে, সুরা আস-সাফফাতের প্রথমোক্ত আয়াতে যে-পুত্রের সুসংবাদ উল্লেখ করা হয়েছে, তার দ্বারা হযরত ইসমাইল ব্যতীত আর কী উদ্দেশ্য হতে পারে?

আর যখন হযরত ইবরাহিম আ. হাজেরা রা. ও ইসমাইল আ.-কে মক্কায় রেখে গিয়েছিলেন, তখন তাদের জন্য দোয়া করে এভাবে শোকর আদায় করেছিলেন—

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ (سورة إبراهيم)

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাইল ও ইসহাককে দান করেছেন।" [সুরা ইবরাহিম : আয়াত ৩৯]

এই আয়াতও সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সুরা আস-সাফফাতের আয়াতে যে-পুত্রের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হযরত ইসমাইল আ.।

খৎনা

হযরত ইবরাহিম আ.-এর বয়স যখন নিরানব্বই বছর তখন হযরত ইসমাইল আ.-এর বয়স হলো তেরো বছর। তখন আল্লাহপাকের নির্দেশ এলো : খৎনা করো। এই আদেশ পালনে প্রথমে ইবরাহিম আ. নিজের খৎনা করলেন। এরপর তিনি হযরত ইসমাইল আ., পরিবারের সব সদস্যের এবং গোলামদের খৎনা করালেন।

"তখন ইবরাহিম নিজের পুত্র ইসমাইলের এবং গৃহবাসী সবার এবং দাসদের অর্থাৎ ইবরাহিমের ঘরের সদস্যদের মধ্যে যত পুরুষ ছিলো, সে-দিনই সকলের খৎনা করালেন। যেভাবে আল্লাহপাক তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। যখন ইবরাহিম আ.-এর খৎনা করা হয়েছিলো তখন তার বয়স ছিলো নিরানব্বই বছর। আর যখন তাঁর পুত্রের (ইসমাইলের) খৎনা করা হলো তখন তার বয়স ছিলো তেরো বছর।"[৩৮]

এই খৎনাই ইবরাহিমি ধর্মের প্রতীক এবং সুন্নাতে ইবরাহিম নামে অভিহিত।

জবহে আযিম বা কুরবানি

সাধারণ মানুষের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার মুআমালা যেমন হয়, আল্লাহপাকের দরবারে সান্নিধ্যপ্রাপ্ত মহাপুরুষদের সঙ্গে তাঁর মুআমালা তেমন হয় না। তাঁদেরকে পরীক্ষা এবং বিপদাপদের কঠিন থেকে কঠিনতম ধাপসমূহ অতিক্রম করতে হয়। আর প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহর জন্য জান সোপর্দ করে দেয়া, আত্মসমর্পণ করা এবং আল্লাহর আদেশের প্রতি সম্মতি ও সন্তুষ্টির পরিচয় দিতে হয়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস

---

[৩৮] তাওরাত : আবির্ভাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৭, আয়াত ২৩-২৫।

সালামকে তাঁদের মর্যাদা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা ও বিপদাপদে নিপতিত করা হয়।

হযরত ইবরাহিম আ.-ও উচ্চ মর্যাদাবান নবী ও রাসুল ছিলেন। এজন্য তাঁকেও বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা ও বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং তিনি মর্যাদার উচ্চতার প্রেক্ষিতে বরাবরই পরীক্ষায় সফলকাম প্রমাণিত হয়েছেন।

তখন তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো তখন তিনি যে-চূড়ান্ত ধৈর্য ধারণ করেছেন এবং আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদিরে যে-সন্তুষ্টির প্রমাণ দিয়েছে, যে-দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন এবং নিজের সিদ্ধান্তের ওপর অটল থেকেছে তা কেবল তাঁরই যোগ্য কাজ ছিলো। এরপর যখন হযরত হাজেরা রা. ও হযরত ইসমাইল আ.-কে মক্কার অনাবাদ পাথুরে ভূমিতে ছেড়ে আসার নির্দেশ দেয়া হলো তাও সাধারণ পরীক্ষা ছিলো না। সেটা ছিলো কঠিন পরীক্ষার সময়। বার্ধক্য ও বুড়ো বয়সের নানা ধরনের আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র, দীর্ঘ দিবস ও রজনীর প্রর্থনার ফল এবং পরিবারের আশার আলো ইসমাইলকে কেবল আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে পানি ও তৃণলতাহীন মরু প্রান্তরে ছেড়ে দিয়ে আসছেন। একবার পেছনে ফিরেও তার দিকে তাকাচ্ছেন না, পাছে এমন না হয় যে, পিতৃস্নেহ উথলে ওঠে এবং আল্লাহর আদেশ পালনে কোনো প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে যায়।

এই দুটি কঠিন পরীক্ষার মঞ্জিল অতিক্রম করার পর একটি তৃতীয় পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছে, যা ছিলো আগের দুই পরীক্ষার চেয়েও অধিক পিত্ত বিগলনকারী ও হৃদয়বিদারক পরীক্ষা। এটাই একাধারে তিন রাত ইবরাহিম আ. স্বপ্নে দেখছেন যে, আল্লাহ তালাআ বলছেন, হে ইবরাহিম, তুমি আমার রাস্তায় তোমার একমাত্র পুত্রকে কুরবানি করো।

আম্বিয়ায়ে কেরামের স্বপ্ন 'সত্য স্বপ্ন' এবং আল্লাহর ওহি হয়ে থাকে। সুতরাং হযরত ইবরাহিম আ. সম্মতি ও আত্মসমর্পণের মূর্ত প্রতীক হয়ে সত্বর আল্লাহর আদেশ যথাসম্ভব পালনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিন্তু এ-বিয়ষটি একা নিজের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলো না; বরং এই পরীক্ষার অন্য একটি অংশ ছিলো তাঁর পুত্র, যাঁকে কুরবানি করার আদেশ দেয়া হয়েছে। তাই তিনি পুত্রের কাছে স্বপ্নের বৃত্তান্ত এবং আল্লাহপাকের নির্দেশ বর্ণনা করলেন। পুত্র ছিলেন হযরত ইবরাহিম আ.-এর মতো মুজাদ্দিদে আম্বিয়ার পুত্র। তৎক্ষণাৎ তিনি আত্মসমর্পণের মস্তক অবনত

করে দিলেন এবং বললেন, এটাই যদি আল্লাহ ইচ্ছা হয়ে থাকে, হবে ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে সহনশীল পাবেন। এই কথোপকথনের পর পিতা-পুত্র নিজেদের কুরবানি পেশ করার জন্য অরণ্যের দিকে যাত্রা করলেন। পিতা পুত্রের সম্মতি পেয়ে জবাইয়ের পশুর মতো পুত্রের হাত-পা বেঁধে ফেললেন। ছুরি ধার দিলেন এবং পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে জবাই করতে উদ্যত হলেন। তৎক্ষণাৎ হযরত ইবরাহিম আ.-এর ওপর আল্লাহর ওহি নাযিল হলো : হে ইবরাহিম, তুমি নিজের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছো। নিঃসন্দেহে এটা বড় কঠিন পরীক্ষা ছিলো। এখন পুত্রকে ছেড়ে দাও এবং তোমার কাছে এই দুম্বাটি দাঁড়িয়ে রয়েছে, পুত্রের পরিবর্তে সেটিকে জবাই করো। আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে এভাবেই বিনিময় প্রদান করে থাকি। হযরত ইবরাহিম আ. পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেলেন, ঝোপের কাছে একটি দুম্বা দাঁড়িয়ে আছে। ইবরাহিম আ. আল্লাহর শোকর আদায় করে সেই দুম্বাটিকে জবাই করলেন।

এটাই সেই কুরবানি যা আল্লাহর দরবারে এমনভাবে কবুল হয়েছে যে স্মৃতিস্মারক হিসেবে তা সবসময়ের জন্য ইবরাহিমি মিল্লাতের প্রতীক সাব্যস্ত হয়ে থাকলো এবং আজো প্রতি বছর যিলহজ মাসের দশ তারিখে ইসলামি বিশ্বে এই প্রতীকটি পালন করা হয়।

কিন্তু এই পূর্ণ ঘটনার মধ্য থেকে এ-কথা প্রমাণিত হলো না যে, হযরত ইবরাহিম আ.-এর সন্তানদের মধ্যে কুরবানির পাত্র কে—ইসমাইল আ. না ইসহাক আ.?

কুরআন মাজিদ যদিও যাকে জবাই করা হয়েছে তার নাম উল্লেখ করে নি, কিন্তু যেভাবে ঘটনাটি আলোচনা করেছে, তা থেকে বাধাহীনভাবে প্রকাশ পায় যে, কুরআন মাজিদের আয়াত ইসমাইল আ.-কেই 'যবিহ' বা কুরবানির পাত্র বলছে। এবং এটাই সঠিক ও প্রকৃত তথ্য।

সুরা আস-সাফফাতে এই ঘটনাকে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে—

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ () فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ () فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ () فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ () وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ () قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ () إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ

الْمُبِينُ () وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ () وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ () سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ () كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ () إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ () وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ () وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (سورة الصافات)

'"হে আমার প্রতিপালক, আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ (পুত্র) সন্তান দান করো।" সুতরাং আমি তাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। এরপর সে যখন তাঁর পিতার সঙ্গে কাজ করার মতো বয়সে উপনীত হলো তখন ইবরাহিম বললো, "বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি জবাই করছি। এখন, তোমার অভিমত কী বলো?" সে বললো, "হে আমার পিতা, আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা-ই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।" যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করলো এবং ইবরাহিম তার পুত্রকে কাত করিয়ে শায়িত করলো, তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম, "হে ইবরাহিম, তুমি স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে!"—এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয় ইহা ছিলো এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাকে মুক্ত করলাম এক কুরবানির[৩৯] বিনিময়ে। আমি তা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি।[৪০] ইবরাহিমের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি। সে ছিলো আমার মুমিন বান্দাদের অন্যতম। আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের (জন্মের), সে ছিলো এক নবী, সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। আমি তাকে বরকত দান করেছিলাম এবং ইসহাককেও; তাদের বংশধরদের মধ্যে কতিপয় সৎকর্মপরায়ণ এবং কতিপয় নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী।'
[সুরা আস-সাফফাত : আয়াত ১০০-১১৩]

এই আয়াতগুলোতে হযরত ইবরাহিম আ.-এর দুই পুত্রের সুসংবাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম পুত্রের নাম নেয়া হয় নি; শুধু ধৈর্যশীল বালক বলেই তাঁর মহান কুরবানির ঘটনা আলোচনা করা হয়েছে।

[৩৯] তা ছিলো একটি দুম্বা, যা বেহেশত থেকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো।
[৪০] ঈদুল আযহায় কুরবানির রীতি প্রবর্তিত করে।

এরপর দ্বিতীয় পুত্রের সুসংবাদ নাম উল্লেখ করেই প্রদান করা হয়েছে : "আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ প্রদান করলাম।" আর এটা স্বতসিদ্ধ বিষয় যে, ইবরাহিম আ.-এর দুই পুত্র ইসমাইল ও ইসহাকের মধ্যে ইসমাইল বয়সে বড় এবং ইসহাক ছোট। সুতরাং শেষে আয়াতে যখন নাম উল্লেখ করেই ছোট পুত্রের কথা বর্ণনা করা হলো তখন প্রথম আয়াত হযরত ইসমাইল ছাড়া আর কার আলোচনা হতে পারে? নিঃসন্দেহে তিনি হযরত ইসমাইল আ.। তিনিই বলেছিলেন, "নিশ্চয় আমাকে সহনশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।" এবং তাঁকেই ইবরাহিম আ. কাত করে শুইয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তিনি "আমি তাকে মুক্ত করলাম এক কুরবানির বিনিময়ে"-এর মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তা ছাড়া বিষয় এই যে, কেবল কুরআন মাজিদই ইসমাইলকে 'জবাইয়ের পাত্র' বলে না; বরং তাওরাতের আয়াতসমূহে গভীর দৃষ্টিতে পাঠ করলে বুঝা যাবে, তাওরাত এটাই বলে যে, ইসমাইল আ. এবং কেবল ইসমাইল আ.-ই 'জবাইর পাত্র'।

"এসব কথার পর আল্লাহ ইবরাহিমকে পরীক্ষা করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, তুমি তোমার পুত্রকে, হ্যাঁ, তোমার একমাত্র পুত্রকে, যাকে তুমি অত্যন্ত স্নেহ করো—ইসহাককে—সঙ্গে নাও এবং মুরিয়া নামক স্থানে যাও। তাকে ওখানকার পাহাড়গুলো থেকে একটির ওপর রাখো, যা আমি তোমাকে বলে দেবো। 'পুড়িয়ে ফেলা'র অনুরূপ কুরবানির জন্য তাকে উৎসর্গ করো।"[৪১]

"তখন পুনরায় আল্লাহর ফেরেশতা আসমানের ওপর থেকে ইবরাহিমকে ডেকে বললো, আল্লাহপাক বলেন, যেহেতু তুমি এরূপ কাজ করেছো, এবং নিজের পুত্র, একমাত্রই পুত্র, আফসোস করো না। আমি আমার সত্তার খসম খাচ্ছি। আমি বরকত দিতেই তোমাকে বরকত দিবো।"[৪২]

তাওরাতের এসব বাক্যের চিহ্নিত অংশগুলো—তোমার একমাত্র পুত্র এবং নিজের একমাত্র পুত্র—এর প্রতি লক্ষ করুন এবং তাওরাতের পূর্বোক্ত আয়াতগুলো পাঠ করুন যাতে ইসমাইল আ.-কে হযরত ইবরাহিম আ.-এর একমাত্র পুত্র বলা হয়েছে। [একমাত্র পুত্র বলার]

---

[৪১] তাওরাত : আবির্ভাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ২২, আয়াত ১-২।

[৪২] তাওরাত : আবির্ভাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ২২, আয়াত ১৫-১৬।

কারণ এই যে, হযরত ইসমাইল আ.-এর বয়স যখন তেরো বছর, তখন হযরত ইসহাক আ. জন্মগ্রহণ করেন। এ থেকে কি এ-কথা পরিষ্কার বুঝা যায় না যে, 'যবিহ' বা 'কুরবানির পাত্র' হওয়া সন্তানটিকে বনি ইসরাইলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করার জন্য এটা লোভাত্মক অযৌক্তিকতা, যা ইহুদি জাতিকে এই পরিবর্তনের প্রতি উৎসাহিত করেছে যে, তারা ওই বাক্যে 'একমাত্র পুত্র'-এর সঙ্গে ইসহাক আ.-এর নামটি অযথা যোগ করে দিয়েছে? সুতরাং এই সংযোজন তাওরাতের বর্ণনাসমূহেরও বিরোধী এবং কুরআন মাজিদের বর্ণনারও বিরোধী। এবং তা নিশ্চিতভাবে প্রকৃত ঘটনা ও প্রকৃত সত্যেরও বিপরীত।

যাইহোক। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে 'আল্লাহর উদ্দেশে কুরবানির পাত্র' হওয়ার মহান মর্যাদা হযরত ইসমাইল আ.-এর জন্যই নির্ধারিত ছিলো।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (سورة الجمعة)

'তা আল্লাহরই অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ তো মহা অনুগ্রহশীল।' [সুরা জুমআ : আয়াত ৪]

অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার হলো ইসলামের কতিপয় আলেমকেও এই ভ্রমে আক্রান্ত দেখা যাচ্ছে যে ইসমাইল আ. কুরবানির পাত্র ছিলেন না ইসহাক আ. কুরবানির পাত্র ছিলেন। এ-প্রসঙ্গে তাঁরা যেসব প্রমাণ পেশ করছেন, আফসোস, ওইসব প্রমাণের ক্ষেত্রে আমরা তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। কেননা, তাঁদের প্রমাণগুলোর ভিত্তি ও বুনিয়াদ কেবল কল্পনা ও ধারণার ওপর স্থাপিত; কোনো দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। যেমন : তাদের একটি বড় প্রমাণ এই যে, সুরা আস-সাফফাতের উপরিউক্ত আয়াতসমূহ থেকে প্রথম আয়াত فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ 'সুতরাং আমি তাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।'-এর মধ্যে কোনো নাম উল্লেখ করা হয় নি এবং তার পরের আয়াতগুলোতে সেই ধৈর্যশীল পুত্রের কুরবানি সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ 'আমি তাকে ইসহাকের (জন্মের) সুসংবাদ দিয়েছিলাম।' তাহলে কি সেই غُلَامٍ حَلِيمٍ বা স্থিরবুদ্ধি পুত্রও এই ইসহাক নয়? কিন্তু আপনি নিজেই অনুমান করুন এটা কত বড় ভুল প্রমাণ। প্রথমত, এই আয়াতগুলোর

পূর্বাপর সম্পর্ক অনুধাবন করুন। তারপর চিন্তা করুন 'আমি তাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম' বাক্যের পরে 'আমি তাকে ইসহাকের (জন্মের) সুসংবাদ দিয়েছিলাম' বাক্যটিকে সংযোজক অব্যয়ের মাধ্যমে যেভাবে পৃথক করে দেয়া হয়েছে তাতে কি আরবি ব্যাকরণ অনুসারে এই দুটি বাক্যে উল্লেখিত ব্যক্তিদ্বয়কে একই ব্যক্তি সাব্যস্ত করার কোনো অবকাশ আছে? বিশেষত, যখন তাঁদের উভয়ের সুসংবাদ উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে তাঁদের গুণাবলিও বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। 'কাসাসুল আম্বিয়া' কিতাবের রচয়িতা আল্লামা আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার এ-ক্ষেত্রে وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ 'আমি তাকে বরকত দান করেছিলাম এবং ইসহাককেও' আয়াতে عَلَيْهِ শব্দের সর্বনামটির উদ্দেশ্য ذبيح অর্থাৎ কুরবানির পাত্র বলেছেন এবং তিনি এর অনুবাদ করেছেন এমন : আমি বরকত নাযিল করেছি সেই -এর ওপর এবং ইসহাকের ওপর। তিনি এই দাবি করেছেন, পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করার পর ইসহাক আ.-এর সুসংবাদ প্রদানের উল্লেখ এ-কথার অকাট্য প্রমাণ যে, কুরবানির ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুত্র ইসহাক ব্যতীত অন্যকেউ, ইসহাক নন; বরং তিনি কেবল ইসমাইল আ.-ই হতে পারেন।

তা ছাড়া এই ঘটনাটি মক্কার অনতিদূরে 'মিনা' নামক স্থানে ঘটেছিলো। তাওরাতের এই বাক্য—একমাত্র পুত্র—এ-কথার জ্বলন্ত সাক্ষ্য যে, ইসমাইল আ.-এর কুরবানি পর্যন্ত ইসহাক আ.-এর জন্ম হয় নি। সুতরাং তাওরাতের এই ঘটনাকে 'মুরিয়ার' নিকট বলা ওইরকমের পরিবর্তন, যা থেকে তাওরাতের কোনো অধ্যায়ই মুক্ত নয়। আর উল্লিখিত সত্যের অবিশ্বাস বাস্তব সত্যেরই অবিশ্বাস।[৪৩]

এ-বিষয়টি যদিও অত্যন্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যার দাবি রাখে, কিন্তু আমি এখানে কেবল জরুরি বিষয়গুলোর আলোচনা করেই ক্ষান্ত হচ্ছি।[৪৪]

---

[৪৩] তাওরাতের পরিবর্তন ও বিকৃত সম্পর্কে জানতে মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানবি (কুদ্দিসা সিররুহু) কর্তৃক রচিত إظهار الحق গ্রন্থটির পাঠ প্রণিধানযোগ্য।

[৪৪] এ-বিষয় মাওলানা আবদুল হামিদ সাহেব রহ. রচিত الرأى الصحيح فى من هو الذبيح পুস্তিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সংকলন।

কা'বাগৃহ নির্মাণ

হযরত ইবরাহিম আ. ফিলিস্তিনে অবস্থান করলেও সবসময়ই ইসমাইল আ. ও হযরত হাজেরা রা.-কে দেখার জন্য মক্কায় আসতেন। এই সময়ের মধ্যে হযরত ইবরাহিম আ.-এর প্রতি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ এলো : কা'বাতুল্লাহ নির্মাণ করো। হযরত ইবরাহিম আ. হযরত ইসমাইল আ.-এর সঙ্গে আলোচনা করে পিতা-পুত্র মিলে বাইতুল্লাহ শরিফের নির্মাণকাজ শুরু করে দিলেন।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি রহ. তাঁর সহিহুল বুখারির ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফাতহুল বারি'র ৮ম খণ্ডের ১৩৮ পৃষ্ঠায় রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। যা থেকে প্রকাশ পায় যে, বাইতুল্লাহ শরিফের ভিত্তি প্রথমে আদম আ.-এর হাতে স্থাপিত হয়েছিলো। ফেরেশতারা তাঁকে সেই স্থানটি দেখিয়ে দিয়েছিলেন যেখানে কা'বাগৃহ নির্মিত হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু হাজার হাজার বছরে ঘটনাবলি বহুকাল আগেই সেটিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলো। অবশ্য হযরত ইবরাহিম আ.-এর কালে নিশ্চিহ্ন গৃহটি একটি টিলা বা মাটির ঢিবির আকারে বিদ্যমান ছিলো। আল্লাহর ওহি হযরত ইবরাহিম আ.-কে এই স্থানটির কথা বলে দিয়েছিলো। তিনি হযরত ইসমাইল আ.-এর সহায়তায় তা খুঁড়তে শুরু করলেন। প্রাচীন নির্মাণের ভিত্তিমূল দেখা যেতে লাগলো। সেই ভিত্তিমূলের ওপরই হযরত ইবরাহিম আ. কর্তৃক বাইতুল্লাহ শরিফ নির্মিত হলো। কিন্তু কুরআন মাজিদ বাইতুল্লাহ নির্মাণের আলোচনা ইবরাহিম আ. থেকেই শুরু করেছে এবং তার পূর্ববর্তী অবস্থার কোনো আলোচনা করে নি।

সারকথা হলো, কা'বাগৃহ নির্মাণের পূর্বে সমগ্র বিশ্বে এবং পৃথিবীর আনাচে-কানাচে প্রতিমাসমূহ এবং নক্ষত্রমণ্ডলীর পূজার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিলো। আর ওইসব মূর্তি ও নক্ষত্রের নামে বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করা হতো।

মিসরবাসীদের ওখানে সূর্যদেবতা, ইযদারিস, ইযিয়াস, হুরিয়াস এবং বাআ'ল দেবতা সবার নামেই মন্দির ছিলো। আশুরিরা বাআ'ল দেবতার মন্দির নির্মাণ করেছিলো এবং ধাতু ও প্রস্তর দ্বারা আবুল হাওল (স্ফিংস)-এর প্রতিকৃতি নির্মাণ করে রেখেছিলো। এতে তার দৈহিক মহত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়েছিলো। কিনআনি সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ দুর্গ বাআ'লা বাক্কের ভেতরে সেই বাআ'লের মন্দির নির্মাণ করেছিলো। তা আজ পর্যন্ত

স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ বিদ্যমান আছে। গার্‌রাহ-এর অধিবাসীরা 'দাজুন' নামক মৎসদেবীর মন্দিরে দেবতার উদ্দেশে নৈবেদ্যসমূহ অর্পণ করতো। তার মৎসদেবীর আকৃতি বানিয়েছিলো মানুষের আর দেহ বানিয়েছিলো মাছের। আমুনিগণ সূর্যদেবতার সঙ্গে চন্দ্রদেবীর আকৃতি বানিয়ে পূজা করতো। এটির জন্য তারা জাঁকজমকপূর্ণ বিরাট মন্দির নির্মাণ করেছিলো। পারসিকরা আগুনের পবিত্রতা ঘোষণা করে অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করেছিলো। রোমানরা মসিহ আ. এবং কুমারী মারইয়াম আ.-এর মূর্তি বানিয়ে তাদের গির্জসমূহকে অলঙ্কৃত করেছিলো। আর হিন্দুস্তানের অধিবাসীরা মহাত্মা বুদ্ধদেব, শ্রী রামচন্দ্র, শ্রী মহাবীর, শ্রী মহাদেবকে দেবতা ও অবতার মনে করে কালীদেবী, শীতলাদেবী, সীতাদেবী, পার্বতীদেবী নামে হাজার হাজার মূর্তির পূজার জন্য কেমন কেমন বিরাট বিরাট মন্দির নির্মাণ করেছে। হারদোয়ার (হরিদ্বার), প্রয়াগ, কাশী, পুরী, টেকশালা, সাঁচী এবং বুদ্ধগয়ার মতো তীর্থস্থানসমূহ তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করছে।

কিন্তু সেগুলোর বিপরীতে কেবল এক আল্লাহর ইবাদত এবং তাঁর একত্বের অঙ্গীকার করে মস্তক অবনত করার জন্য, অথবা এরূপ বলুন, আল্লাহ তাআলার একত্বের সমুন্নত মস্তক প্রকাশ করার জন্য গোটা দুনিয়ার মূর্তির আখড়াসমূহের মধ্যস্থলে যে-প্রথম গৃহ আল্লাহর ঘর নামে অভিহিত হলো তা এই 'বাইতুল্লাহ শরিফ'।

কবি ইকবাল বলেন—

وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا

خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا

'ইবরাহিম খলিল যে-গৃহের একজন রাজমিস্ত্রি ছিলেন, তা-ই সমগ্র বিশ্বের বুকে সর্বপ্রথম ইবাদতখানা, যা 'আল্লাহর ঘর' নামে অভিহিত হয়েছে।'

কুরআন মাজিদ বলছে—

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (سورة آل عمران)

'নিশ্চয় মানবজাতির জন্য (আল্লাহকে স্মরণ করার উদ্দেশে) সর্বপ্রথম যে-গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তা তো বাক্কায় (মক্কার অপর নাম বাক্কা), তা

(পুরোপুরি) বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী।' [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৯৭]

এবারের নির্মাণের এই মর্যাদা রয়েছে যে, হযরত ইবরাহিম আ.-এর মতো আল্লাহর বন্ধু, অতি উচ্চ মর্যাদাবান নবী এর রাজমিস্ত্রি। আর হযরত ইসমাইল আ.-এর মতো নবী ও আল্লাহর যবিহ (আল্লাহর নামে কুরবানির জন্য উৎসর্গিত) তাঁর জোগাড়ে। পিতা ও পুত্র বাইতুল্লাহর নির্মাণকাজে রত আছেন। যখন কা'বাগৃহের দেয়ালগুলো গাঁথতে গাঁথতে উপরে উঠে গেলো এবং সম্মানিত পিতার হাত উপরে পাথর গাঁথতে অক্ষম হয়ে গেলো তখন আল্লাহর নির্দেশে একটি পাথরকে ভারারূপে ব্যবহার করা হলো। হযরত ইসমাইল আ. নিজের হাতে এটিকে ধরে রাখতেন এবং হযরত ইবরাহিম আ. এর ওপর দাঁড়িয়ে পাথর গেঁথে যেতেন। এই ভারাই সেই স্মৃতিচিহ্ন যা আজো মাকামে ইবরাহিম নামে পরিচিত। এখন যেখানে হাজরে আসওয়াদ (কৃষ্ণ পাথর) লাগানো রয়েছে, যখন নির্মাণকাজ এই সীমায় পৌঁছলো তখন হযরত জিবরাইল আ. হযরত ইবরাহিম আ.-কে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন এবং কাছের একটি পাহাড় থেকে হাজরে আসওয়াদকে, যা জান্নাত থেকে আনীত পাথর বলে কথিত, সুরক্ষিত অবস্থায় বের করে তার সামনে রেখে দিলেন, যেনো তা যথাস্থানে লাগিয়ে দেয়া হয়।

বাইতুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর নির্মিত হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহিম আ.-কে বললেন, এটা ইবরাহিমি দীনের কেবলা এবং আমার সামনে মস্তক অবনত করার প্রতীক। সুতরাং এটিকে একত্ববাদের কেন্দ্র সাব্যস্ত করা হলো। হযরত ইবরাহিম আ. ও ইসমাইল আ. তখন দোয়া করলেন, আল্লাহ তাআলা যেনো তাদেরকে এবং তাদের সন্তানদেরকে সালাত কায়েম করা এবং যাকাত প্রদান করার হেদায়েত দান করেন। এসব বিধানের ওপর দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বও দান করেন। তা ছাড়া তাদের জন্য নানা ধরনের ফল, মেওয়া ও রিযিকের বরকত দান করেন। আর সমগ্র বিশ্বের দিগ-দিগন্তের বাসিন্দাদের মধ্য থেকে হেদায়েতপ্রাপ্তদের দলকে এদিকে আকৃষ্ট করে দেন, যেনো তারা দূর-দূরান্ত থেকে এসে হজের কাজগুলো আদায় করে এবং হেদায়েত ও

সৎপথপ্রাপ্তির এই কেন্দ্রস্থলে একত্র হয়ে নিজেদের জীবনের সৌভাগ্য লাভ করে।

কুরআন মাজিদ বাইতুল্লাহ শরিফ নির্মাণকালে হযরত ইবরাহিম ও ইসমাইল আ.-এর মুনাজাত, সালাত কায়েম করা এবং হজের করণীয় কার্যাবলি সম্পন্ন করার জন্য আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ এবং বাইতুল তাওহিদ বা একত্ববাদের কেন্দ্রস্থল হওয়ার ঘোষণা জায়গায় জায়গায় উল্লেখ করেছে। তার মহত্ত্ব ও উচ্চ মর্যাদাকে নতুন নতুন বর্ণনাশৈলীতে নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে ব্যক্ত করেছে—

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ () فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (سورة آل عمران)

'নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে-গৃহ (আল্লাহর ইবাদতের ইবাদতখানা ও কেন্দ্ররূপে) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তা তো (এ ইবাদতখানাই) বাক্কায় (মক্কার অপর নাম বাক্কা), তা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী। তাতে (সত্যধর্মের) অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, (যেমন) মাকামে ইবরাহিম, (অর্থাৎ ইবরাহিম আ.-এর দাঁড়াবার ও ইবাদত করার স্থান যা ওই সময় থেকে আজ পর্যন্ত নিঃসন্দেহে প্রসিদ্ধ ও নির্দিষ্ট রয়েছে।) আর (তার মধ্যে এ-বিষয়টিও যে,) যে-কেউ সেখানে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ (নিরপত্তা ও হেফাজতের মধ্যে এসে যাবে)। আর (তার মধ্যে এটাও যে,) মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশে ওই গৃহের হজ করা তার অবশ্য কর্তব্য। এবং কেউ (এই সত্যকে) প্রত্যাখ্যান করলে (এই সেই স্থানের পবিত্রতা ও ফযিলতের প্রতি বিশ্বাস না করলে সে জেনে রাখুক), নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন। (তিনি নিজের কাজের জন্য কোনো ব্যক্তি বা দলের মুহতাজ বা মুখাপেক্ষী নন।)' [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ৯৭-৯৮]

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ () وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ () وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ () رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ () رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورة البقرة)

'আর সেই সময়কে স্মরণ করো, যখন (মক্কার) ওই গৃহকে (কা'বাগৃহকে) মানবজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল বানিয়েছিলাম (এবং নির্দেশ দিয়েছিলাম), "তোমরা মাকামে ইবরাহিমকে[৪৫] (চিরকালের জন্য) সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো।" এবং ইবরাহিম ও ইসমাইলকে তাওয়াফকারী[৪৬], ইতিকাফকারী[৪৭], রুকু ও সিজদাকারীদের[৪৮] জন্য আমার গৃহকে (সবসময়) পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম। (কুফর ও নাফরমানির অসূচিতার মাধ্যমে অপবিত্র করো না।) স্মরণ করো, যখন ইবরাহিম বলেছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক, একে (এই স্থানটিকে, যা দুনিয়ার আবাদ ও উর্বর ভূখণ্ডগুলো থেকে দূরে এবং সজীবতা ও সতেজতা থেকে একেবারে বঞ্চিত) নিরাপদ (শান্তি ও নিরাপত্তার) শহর করো, আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান আনে তাদেরকে ফলমূল থেকে জীবিকা প্রদান করো।" (ইবরাহিমের প্রার্থনার জবাবে) তিনি বললেন, (তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হলো এবং এখানকার অধিবাসীদের মধ্য থেকে) যে-কেউ কুফরি করবে তাকেও কিছুকালের জন্য (জীবিকার সরঞ্জামাদি দিয়ে) জীবনোপভোগ করতে দেবো, তারপর তাকে জাহান্নামের (কৃতকর্মের)

---

[৪৫] যে-পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে ইবরাহিম আ. কা'বাগৃহ নির্মাণ করেছিলেন।

[৪৬] তাওয়াফ : কা'বাগৃহ প্রদক্ষিণ করাকে তাওয়াফ বলা হয়। এটি হজের একটি বিশেষ রুকন।

[৪৭] কিছুকালের জন্য বিশেষ নিয়মে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মসজিদে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকাকে 'ইতিকাফ' বলে। রমযান মাসের শেষ ইতিকাফ পালন করা সুন্নতে কেফায়া।

[৪৮] রুকু ও সিজদা সালাতের দুটি রুকন।

শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করবো (যে-হতভাগ্যরা নেয়ামতের পথ ত্যাগ করে আযাবের পথ অবলম্বন করে, তবে তাদের সে-পথ কতই না মন্দ) এবং কত নিকৃষ্ট তাদের প্রর্ত্যাবর্তনস্থল! স্মরণ করো, (সেটা ছিলো কী গুরুত্বপূর্ণ ও বিপ্লবমণ্ডিত সময়) যখন ইবরাহিম ও ইসমাইল কাবা'গৃহের প্রাচীর তুলছিলো তখন (তাদের হাত তো কাজ করছিলো এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে ও মুখে) তারা (এই দোয়া) বলেছিলো, "হে আমাদের প্রতিপালক, (আপনার দুজন দুর্বল বান্দা আপনার পবিত্র নামে এই গৃহের ভিত্তি স্থাপন করছি) আমাদের এই কাজ গ্রহণ করো, নিশ্চয় তুমি (দোয়াসমূহের) সর্বশ্রোতা, (এবং দুনিয়ার সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে) সর্বজ্ঞাতা। হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত করো এবং আমাদের বংশধর থেকে তোমার এক অনুগত উম্মত বানিও (আপনার দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে এই তাওফিক দান করুন যেনো আমরা সত্যিকারের মুসলিম অর্থাৎ আপনার হুকুমের অনুগত হয়ে যাই)। আমাদেরকে ইবাদতের (সঠিক) নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও (আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন)। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (আপনিই একমাত্র সত্তা যিনি আপন রহমতে ক্ষমা করে থাকেন, যাঁর 'রহিম'সুলভ ক্ষমা সীমাহীন)। হে আমাদের প্রতিপালক, (আপনার দয়া ও অনুগ্রহে) তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এক রাসুল প্রেরণ করো, যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের কাছে তেলাওয়াত করবে; তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে (নিজের নবীসুলভ শিক্ষা ও উপদেশের মাধ্যমে তাদের অন্তরসমূহকে পরিষ্কার ও মার্জিত করবে)। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"' [সুরা বাকারা : আয়াত ১২৫-১২৯]

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ () وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ () لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ () ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ () ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ

حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ () حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ () ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ () لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (سورة الحج)

'এবং স্মরণ করো (সেই সময়ের কথা), যখন আমি ইবরাহিমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সেই গৃহের (সঠিক) স্থান, (তখন নির্দেশ দিয়েছিলাম,) "আমার সঙ্গে কোনো শরিক স্থির করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখো তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে এবং যারা সালাতে দাঁড়ায়, রুকু ও সিজদা করে (ইবাদতে তৎপর হয়)। এবং মানুষের কাছে হজের ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার কাছে আসবে পদব্রজে এবং সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটের পিঠে (সব ধরনের যানবাহনে আরোহণ করে), তারা আসবে (দুনিয়ার যাবতীয়) দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে, (এই জন্য আসবে) যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু থেকে যা রিযিক দান করেছেন তার ওপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে[৪৯] (সেগুলোকে কুরবানি করাকালে) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। এরপর তোমরা তা থেকে আহার করো এবং দুস্থ ও অভাবগ্রস্তকে আহার করাও। এরপর তারা যেনো তাদের (দৈহিক) অপরিচ্ছন্নতা দূর করে (ইহরাম ভঙ্গ করে পোশাক খুলে ফেলে) এবং তাদের মানত পূর্ণ করে এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের[৫০]। এটাই বিধান এবং কেউ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলোর (এবং আল্লাহর নির্ধারিত সম্মানিত বস্তুগুলোর) সম্মান করলে তার প্রতিপালকের কাছে তার জন্য এটাই উত্তম। আর (এটা স্মরণ রাখো যে,) তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তু— ওইগুলো ব্যতীত যা তোমাদের শোনানো হয়েছে (কুরআন মাজিদে

---

[৪৯] যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন। ভিন্নমতে কুরবানির দিনগুলোতে।

[৫০] الْبَيْتِ الْعَتِيقِ-এর দ্বারা আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্মিত প্রাচীন গৃহ অর্থাৎ কা'বাঘরকে বুঝায়।—জালালাইন, কাশশাফ, সাফওয়াতুল বায়ান।

অবৈধ বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে)। সুতরাং তোমরা বর্জন করো মূর্তিপূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাকো মিথ্যা কথন থেকে, আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর কোনো শরিক না করে (এই ইবাদতগুলো করো) ; এবং যে-কেউ আল্লাহর শরিক করে সে যেনো আকাশ থেকে পড়লো, এরপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো, কিংবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো। এটাই আল্লাহর বিধান এবং (স্মরণ রেখো) কেউ আল্লাহর নির্দেশনাবলিকে সম্মান করলে তা তার হৃদয়ের তাকওয়াসঞ্জাত (অন্তরের পরহেযগারিমূলক বিষয়সমূহের অন্তর্গত)। এইসব আন'আমে[৫১] তোমাদের জন্য নানাবিধ উপকার রয়েছে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য; এরপর তাদের কুরবানির স্থান প্রাচীন গৃহের কাছে[৫২] (কা'বাগৃহের কাছে পৌঁছে তাদেরকে কুরবানি করতে হবে)। [সুরা হজ্জ : আয়াত ২৬-৩৩]

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ () لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (سورة الحج)

'এবং (দেখো) উটকে (যাকে দূর-দূরান্ত থেকে এই হজের স্থানে আনা হয়) আমি করেছি আল্লাহর (ইবাদতের) নিদর্শনগুলোর অন্যতম; তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে কল্যাণ। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায়[৫৩] তাদের ওপর তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো (তাদের জবাই করার সময়)। যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায় (জবাই করা হয়ে যাবে) তখন তোমরা তা থেকে আহার করো এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে এবং যাচঞাকারী অভাবগ্রস্তকে; এইভাবে আমি ওদেরকে

---

[৫১] আন'আম দ্বারা উট, গরু, মেষ, ছাগল এবং অন্যান্য অহিংস্র ও রোমন্থনকারী জন্তুকে বুঝায়; যথা : হরিণ, নীলগাই, মহিষ ইত্যাদি। কিন্তু ঘোড়া, গাধা এগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়।

[৫২] হারাম-এর সীমানার মধ্যে।

[৫৩] উটকে দাঁড়ানো অবস্থায় তার বুকের অগ্রভাগে ছুরি বসিয়ে জবাই করতে হয়। একে নাহর / نحر বলে।

(জন্তুগুলোকে) তোমাদের অধীন (বশীভূত) করে দিয়েছি যাতে তোমরা (আমার অনুগ্রহের) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। (স্মরণ রেখো) আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না তাদের গোশত এবং রক্ত; বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া (আল্লাহভীতি, হৃদয়ের একনিষ্ঠতা)।[৫৪] এইভাবে তিনি এদেরকে (চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে) তোমাদের অধীন (বশীভূত) করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো এবং এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছেন; সুতরাং তুমি সুসংবাদ দাও সৎকর্মপরায়ণদেরকে (তাদের আমল কবুল হওয়ার সুসংবাদ রয়েছে)।' [সুরা হজ : আয়াত ৩৬-৩৭]

হযরত ইসমাইল আ.-এর বংশধর

হযরত ইসমাইল আ.-এর বংশধর সম্পর্কে কুরআন মাজিদ বা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিসে বিস্তারিত কোনো আলোচনা করা হয় নি। অবশ্য তাওরাত তাঁর সন্তানদের নামসমূহকে পৃথক পৃথক ব্যাখ্যার সঙ্গে উল্লেখ করেছে। তাওরাতের বর্ণনা অনুসারে হযরত ইসমাইল আ.-এর বারোজন পুত্র ছিলেন। তাঁরা বারো সরদার নামে অভিহিত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং তারা আরবের ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের আদি পুরুষ হয়েছেন। আর হযরত ইসমাইল আ.-এর একজনমাত্র কন্যা ছিলেন। তাঁর নাম ছিলো বাশামাহ বা মুহাল্লাত।

"আর ইবরাহিমের পুত্র ইসমাইল, যাকে সারার বাঁদি মিসরীয় হাজেরা ইবরাহিমের জন্য প্রসব করেছিলো, তার বংশপরিচয় এই আর এই হলো ইসমাইলের পুত্রদের নাম :—এদের নামানুসারে ইসমাইলের বংশের

---

[৫৪] وقى ধাতু থেকে নির্গত: অর্থ কষ্টদায়ক বস্তু থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা। তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ ভীতিপ্রদ বস্তু থেকে আত্মরক্ষা করা। ইসলামি পরিভাষায় পাপাচার থেকে আত্মরক্ষা করা বা আল্লাহভীতির নাম তাকওয়া। [রাগিব ইসফাহানি] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, একবার হযরত উমর রা. হযরত উবায় বিন কাব রা.-কে তাকওয়ার ব্যাখ্যা দিতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি জবাবে বলেছিলেন, 'আপনি কি কখনো কাঁটাযুক্ত পথ অতিক্রম করেছেন?' হযরত উমর রা. বললেন, 'হ্যাঁ।' 'আপনি তখন কী করেছিলেন?' উবায় রা. জিজ্ঞেস করলেন। উমর রা. বললেন, 'আমি সাবধানতা অবলম্বন করে দ্রুতগতিতে ওই পথ অতিক্রম করেছিলাম।' হযরত উবায় বিন কা'ব রা. বললেন, 'এটাই তাকওয়া'। [তাফসিরুল কুরতুবি]

শাখা-প্রশাখা বিভক্ত হয়েছিলো—নাবায়ুত, কিদার, ওবাইল, হিশাম, মিশমা, রুমাহ, মানশা, ই'দার, তিমা, ইয়াতুর, নাফিশ, কিদামা এই বারোজন ইসমাইলের পুত্র। তাদের বসতি ও দুর্গসমূহের মধ্যে তাদের নাম এরূপই। তারা নিজেদের বারোটি গোত্রের বারোজন সরদার ছিলেন।"[৫৫]

এদের নাবেত বা নাবায়ুত এবং কিদার নামের বড় দুই পুত্র বেশ বিখ্যাত। তাওরাতের মধ্যে এই দুইজনের উল্লেখ খুব বেশি দেখা যায় এবং আরব ইতিহাসবেত্তাগণও তাঁদের ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করে থাকেন। ইনিই সেই নাবেত বা নাবায়ুত যাঁর বংশধরগণ "আসহাবুল হিজর' নামে অভিহিত ও বিখ্যাত হয়েছিলো। এই দুইজন ব্যতীত বাকি দশ ভাই এবং তাঁদের বংশের অবস্থার পরিচয় খুবই কম পাওয়া যায়।

কুরআন মাজিদে হযরত ইসমাইল আ.-এর আলোচনা

কুরআন মাজিদে বহুবার হযরত ইসমাইল আ.-এর আলোচনা করা হয়েছে, তার মধ্যে শুধু এক জায়গায় তাঁর গুণাবলি বর্ণিত হয় নি। সে-আয়াতটি তাঁর 'যবিহ' হওয়ার বর্ণনাসম্বলিত আয়াত। আর দুই জায়গায় সুসংবাদ প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে হযরত ইবরাহিম আ.-কে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। আর সুরা মারইয়ামে তাঁর নাম উল্লেখ করে তাঁর উৎকৃষ্ট গুণাবলির পরিচয় দেয়া হয়েছে—

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا () وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (سورة مريم)

'স্মরণ করো এই কিতাবে (কুরআন মাজিদে) ইসমাইলের কথা, নিশ্চয় সে ছিলো প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং সে ছিলো রাসুল, নবী; সে তার পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিতো এবং সে ছিলো তাঁর প্রতিপালকের সন্তোষভাজন (পছন্দনীয় ও প্রিয়)।' [সুরা মারইয়াম : আয়াত ৫৪-৫৫]

---

[৫৫] তাওরাত : আবির্ভাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ২৫, আয়াত ১২-১৬।

হযরত ইসমাইল আ.-এর ইন্তেকাল

হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম ১৩৬ বছর বয়সে উপনীত হলে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্তেকালের সময় তাঁর সামনে তাঁর সন্তান-সন্ততি ও বংশধরগণ বহু বিস্তৃতি লাভ করেছিলো। তারা হিজায, শাম (সিরিয়া), ফিলিস্তিন এবং মিসর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলো। তাওরাতের এক জায়গায় ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত ইসমাইল আ. ফিলিস্তিনেই সমাহিত হয়েছেন। এখানেই তাঁর ইন্তেকাল হয়েছিলো। আর আরব ইতিহাসবেত্তাগণ বলেন, তিনি এবং তাঁর মাতা হাজেরা রা. বাইতুল্লাহ শরিফের পাশেই সমাহিত রয়েছেন।

হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম

যখন হযরত ইবরাহিম আ.-এর বয়স একশো বছর এবং তাঁর স্ত্রী হযরত সারা রা.-এর বয়স নব্বই বছর, এ-সময় আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে সুসংবাদ শোনালেন—সারার গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। তার নাম রেখো ইসহাক।

"আল্লাহ ইবরাহিমকে বললেন, তোমার স্ত্রীকে 'সারি' বলা হয়। এখন থেকে তাকে আর 'সারি' বলো না; বরং তার নাম সারাহ। আমি তাকে বরকত প্রদান করবো। কেননা, সে অনেকগুলোর সম্প্রদায়ের মাতা হবে এবং বহু রাজ্যের রাজা তাঁর বংশে জন্মলাভ করবে। তখন ইবরাহিম মস্ত ক অবনত করে মনে মনে হাসতে লাগলেন এবং ভাবলেন, একশো বছর বয়স্ক বৃদ্ধের পুত্র জন্মগ্রহণ করবে আর নব্বই বছর বয়স্কা সারাহ পুত্র সন্তান প্রসব করবে? ইবরাহিম আল্লাহর কাছে আরজ করলেন, আমার ইসমাইল আপনার দরবারে জীবিত থাকলেই আমি আপনার কৃতজ্ঞ থাকবো। আল্লাহ বললেন, নিঃসন্দেহে তোমার স্ত্রী সারাহ তোমার জন্য পুত্র প্রসব করবে, তার নাম রেখো ইসহাক।"[৫৬]

আর কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে—

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ () فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ () وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ () قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ () قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (سورة هود)

'আমার ফেরেশতাগণ[৫৭] তো সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহিমের কাছে এলো। তারা বললো, "সালাম।" সেও বললো, "সালাম।" সে অবিলম্বে (আগন্তুক মেহমানদের সামনে) এক কাবাবকৃত গো-বৎস উপস্থিত

---

[৫৬] তাওরাত : অনুচ্ছেদ ২০, আয়াত ১৫-১৯।

[৫৭] হযরত ইবরাহিম আ.-এর কাছে কয়েকজন ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে প্রেরিত হয়েছিলো। তাঁরা তাঁর স্ত্রী হযরত সারা রা.-এর গর্ভে হযরত ইসহাক আ.-এর জন্মের সুসংবাদ তাঁকে দিয়েছিলেন। এই ফেরেশতাগণই হযরত লুত আ.-এর সম্প্রদায়কে শাস্তি প্রদানের জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন।

করলো। সে যখন দেখলো তাদের হাত সেদিকে (কাবাবকৃত গোশতের দিকে) প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তাদেরকে (অপরিচিত ও) অবাঞ্ছিত মনে করলো এবং তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হলো।[৫৮] তারা (আগন্তুক ফেরেশতারা) বললো, "ভয় করো না, আমরা তো লুতের সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরিত হয়েছি।" আর তাঁর স্ত্রী দণ্ডায়মান (ছিলো) এবং সে হেসেও ফেললো।[৫৯] এরপর আমি তাকে ইসহাকের এবং ইসহাকের পরবর্তী (তার পুত্র) ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম। সে (ইবরাহিম আ.-এর স্ত্রী) বললো, "কী আশ্চর্য! সন্তানের জননী হবো, যখন আমি (নব্বই বছর বয়স্ক) বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী (একশো বছর বয়স্ক) বৃদ্ধ! এটা অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার।" তারা (ফেরেশতারা) বললো, "আল্লাহর কাছে তুমি বিস্ময়বোধ করছো? হে পরিবারবর্গ (ইবরাহিম আ.-এর পরিবারবর্গ), তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও কল্যাণ। তিনি তো প্রশংসার্হ ও সম্মানার্হ।"' [সূরা হুদ : আয়াত ৬৯-৭৩]

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ () فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ () قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (سورة الذاريات)

'এতে তাদের সম্পর্কে তাঁর মনে ভীতির সঞ্চার হলো। তারা বললো, "ভীত হয়ো না।" এরপর তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিলো। তখন তার স্ত্রী (সারা অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে) চিৎকার করতে করতে সামনে এলো এবং গাল চাপড়ে বললো, "এই বৃদ্ধা-বন্ধ্যার সন্তান হবে?" তারা বললো, "তোমার প্রতিপালক এমনই বলেছেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।"' [সূরা আয-যারিয়াত : আয়াত ২৮-৩০]

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ () إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ () قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ () قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ

---

[৫৮] হযরত ইবরাহিম আ. ফেরেশতাদের চিনতে পারেন নি। আল্লাহপাক না জানিয়ে দিলে নবী-রাসুলের পক্ষেও গায়েবের বিষয় জানা সম্ভব নয়। তাই ইবরাহিম তাঁদের জন্য খাদ্য পরিবেশন করলেন। কিন্তু তাঁরা খাদ্য গ্রহণ না করায় শঙ্কিত হলেন।
[৫৯] ইবরাহিম আ.-এর ভয় দূর হওয়ার কারণে হাসলেন।

فَبِمَ تُبَشِّرُونَ () قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ () قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (سورة الحجر)

'আর তাদেরকে বলো ইবরাহিমের অতিথিদের কথা, যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, "সালাম", তখন সে বলেছিলো, "আমরা তোমাদের আগমনে আতঙ্কিত (আমরা তোমাদেরকে ভয় পাচ্ছি)।" তারা বললো, "ভয় করো না, আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সংবাদ দিচ্ছি।" সে বললো, " তোমরা কি আমাকে (পুত্রের) শুভ সংবাদ দিচ্ছো আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও? তোমরা কী বিষয়ে শুভ সংবাদ দিচ্ছো?" তারা বললো, "আমরা সত্য সংবাদ দিচ্ছি; সুতরাং তুমি হতাশ হয়ো না।" সে বললো, "যারা পথভ্রষ্ট তারা ছাড়া আর কে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ থেকে হতাশ হয়?"' [সূরা হিজর : আয়াত ৫১-৫৬]

খৎনা

হযরত ইসহাক আ. ৮ দিনের বয়সে উপনীত হলে হযরত ইবরাহিম আ. শিশুর খৎনা করিয়ে দিলেন। তাওরাতে বলা হয়েছে :

"আর ইবরাহিম আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর পুত্র ৮ দিন বয়স্ক ইসহাককে খৎনা করিয়ে দিলেন।"[৬০]

ইসহাক আসলে মূল উচ্চারণের বিবেচনায় يصحق (ইয়াসহাক)। এটি হিব্রু ভাষার শব্দ; এর আরবি অনুবাদ يضحك (ইয়াদহাকু) অর্থাৎ হাসছে।

আল্লাহর ফেরেশতারা যখন একশো বছর বয়স্ক ইবরাহিম আ.-কে এবং নব্বই বছর বয়স্ক সারা রা.-কে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন, তখন হযরত ইবরাহিম আ. একে বিস্ময়কর ব্যাপার মনে করেছিলেন। হযরত সারাও এই সংবাদ শুনে হেসে উঠেছিলেন। এ-কারণেই পুত্রের এই নাম মনোনীত হয়েছে। বা এই নাম এ-কারণে রাখা হয়েছে যে, হযরত ইসহাকের জন্ম হযরত সারার আনন্দ ও খুশির কারণ হয়েছিলো।

---

[৬০] তাওরাত, অনুচ্ছেদ ২১, আয়াত ৪।

আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী يضحك (ইয়াদহাকু) فعل مضارع-এর রূপ। আরববাসীদের মধ্যে সবসময় এই প্রথা বিদ্যমান ছিলো যে তারা فعل مضارع-এর রূপকে নাম হিসেবে ব্যবহার করতো। যেমন : ইয়ারাব, ইয়ামলেক জাতীয় নাম আরবে বেশ প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ রয়েছে।

হযরত ইসহাক আ.-এর বিয়ে

কুরআন মাজিদে এ-সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। অবশ্য তাওরাতে এ-প্রসঙ্গে একটি দীর্ঘ কাহিনি আলোচিত হয়েছে। তার সারমর্ম এই : হযরত ইবরাহিম আ. তাঁর বাঁদির পুত্র আল-ইয়ারায দেমাশকিকে বললেন, আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, ইসহাকের বিয়ে কখনো আমি ফিলিস্তিনের সেই কিনআনি বংশে করাবো না। আমার ইচ্ছা হলো, নিজের খান্দান ও পিতামহের বংশের মধ্যে তার বিয়ে করাবো। সুতরাং তুমি সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে যাও এবং 'ফাদ্দানে আরাম'-এ আমার ভাই বতুইল বিন নাহুরের কাছে এই পয়গাম পৌছে দাও, সে যেনো নিজের কন্যার বিয়ে আমার পুত্র ইসহাকের সঙ্গে করিয়ে দেয়। যদি সে সম্মত হয় তবে তাকে এটাও বলো যে, আমি ইসহাককে আমার কাছ থেকে দূরে যেতে দিতে চাই না। সে যেনো তার কন্যাকে তোমার সঙ্গে রওয়ানা করিয়ে দেয়।

আল-ইয়ারায হযরত ইবরাহিম আ.-এর নির্দেশ অনুযায়ী 'আরাম' অভিমুখে যাত্রা করলেন। গন্তব্য স্থানের বসতির কাছে পৌছলে তাঁর উটটিকে বসালেন। উদ্দেশ্য, আগেভাগেই অবস্থা জেনে নেবেন। আল-ইয়ারায যেখানে তাঁর উট বসিয়েছিলেন তার কাছেই হযরত ইবরাহিম আ.-এর ভাই বতুইল বিন নাহুরের খান্দান বসবাস করতো। আল-ইয়ারায সবেমাত্র প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তখনই তিনি এক সুন্দর বালিকাকে দেখতে পেলেন। সে পানির কলসি ভরে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলো। আল-ইয়ারায তার কাছে পানি চাইলে সে তাঁকে পানি পান করালো। বালিকা তাঁর উটকেও পানি পান করালো এবং তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করলো। আল-ইয়ারায বতুইলের পরিচয় জিজ্ঞেস করলে বালিকাটি বললো তিনি আমার বাবা। সে আল-ইয়ারাযকে অতিথি হিসেবে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেলো। বাড়িয়ে পৌছে সে তার ভাই লাবানকে অতিথির কথা জানালো।

লাবান আল-ইয়ারাযকে খুব সমাদর করলেন এবং তাঁর আগমনের কারণ জানতে চাইলেন। আল-ইয়ারায হযরত ইবরাহিম আ.-এর পয়গাম শোনালেন। লাবান এই পয়গাম শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি অনেক সাজ-সরঞ্জাম সঙ্গে দিয়ে তাঁর বোন রাফকাহকে আল-ইয়ারাযের সঙ্গে রওয়ানা করিয়ে দিলেন।

হযরত ইসহাক আ.-এর সন্তান-সন্ততি

রাফকাহর গর্ভে হযরত ইসহাক আ.-এর যমজ দুই পুত্র যথাক্রমে ইসু ও ইসহাক জন্মগ্রহণ করেন। তখন হযরত ইসহাক আ.-এর বয়স ছিলো ষাট বছর। ইসহাক আ. ইসুকে বেশি স্নেহ করতেন এবং রাফকাহ ইয়াকুবকে বেশি ভালোবাসতেন। ইসু শিকারি ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে শিকারের গোশত এনে দিতেন। ইয়াকুব তাঁবুতেই থাকতেন।

একদিন ইসু ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে এসে ইয়াকুবকে বললেন, আমি ক্লান্ত আর শিকারও পাওয়া যায় নি। তুমি তোমার খাদ্য মুশুর ও লেপসি থেকে আমাকেও কিছু খেতে দাও। ইয়াকুব বললেন, ফিলিস্তিনবাসীদের প্রথা এই যে, জ্যেষ্ঠ পুত্রই মিরাস পেয়ে থাকে। সুতরাং পিতার ওয়ারিস হবে তুমি। তুমি যদি সেই অধিকার ত্যাগ করো তবে আমি তোমাকে খানা খাওয়াবো। ইসু বললেন, আমার সেই মিরাসের কোনো পরোয়া নেই। তুমিই আমার পিতার ওয়ারিস হও। তখন ইয়াকুব তাঁর ভাই ইসুকে খানা খাওয়ালেন।

একবার হযরত ইসহাক আ. (যখন তিনি অতি বৃদ্ধ এবং তাঁর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে) ইচ্ছা পোষণ করলেন যে, ইসুকে বরকত প্রদান করবেন। তিনি তাঁকে বললেন, যাও, শিকার করে আনো এবং উত্তম খানা পাকিয়ে আমার সামনে পরিবেশন করো। রাফকাহ এ-কথা শুনে মনে মনে বললেন, ইয়াকুব এই বরকত প্রাপ্ত হোন। তৎক্ষণাৎ তিনি ইয়াকুবকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি উত্তম খানা পাকিয়ে তোমার পিতার সামনে উপস্থিত করো এবং বরকতের দোয়া চাও। ইয়াকুব নাম না বলে তা-ই করলেন এবং হযরত ইসহাক আ. থেকে বরকতের দোয়া লাভ করলেন। এরপর ইসু ঘরে এসে বিস্তারিত ঘটনা জানতে পারলেন। তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং ইয়াকুবের প্রতি হিংসা পোষণ করতে শুরু করলেন। রাফকাহ ইয়াকুবকে পরামর্শ দিলেন,

তুমি এখান থেকে কিছুদিনের জন্য তোমার মামা লাবানের কাছে চলে যাও। ইয়াকুব স্ত্রীর কথামতোই কাজ করলেন। মামার কাছে গিয়ে কিছুদিন অতিবাহিত করলেন। একাদিক্রমে মামা লাবানের দুই কন্যা লা'সাহ ও রাহিলকে বিয়ে করলেন।[৬১]

এই রেওয়ায়েতটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে নির্ভরের খুবই অযোগ্য। তাতে যে-চারিত্রিক জীবন উপস্থাপিত হয়েছে তা তাওরাতের অন্যান্য বিকৃত ও পরিবর্তিত রেওয়ায়েতের মতো আম্বিয়াকে কেরাম আলাইহিমুস সালাম এবং তাঁদের বংশের মর্যাদার উপযোগী নয়। কিন্তু এতে এই সম্মানটুকু অবশ্যই পাওয়া যায় যে, ইয়াকুব আ.-এর মামা বাড়িতেই তাঁর বিয়ে হয়েছিলো এবং তিনি এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত ওখানে ছিলেন।

আর ইসু পলায়ন করে তাঁর চাচা হযরত ইসমাইল আ.-এর কাছে চলে গেলেন। ওখানে তাঁর কন্যা বাশামা বা বাসেমা অথবা মুহাল্লাতকে (যে-নামই শুদ্ধ হয়) বিয়ে করলেন। তা ছাড়াও তিনি আরো বেশ কয়েকটি বিয়ে করলেন। এরপর ইসু তাঁর পরিবার-পরিজন নিয়ে 'সাঈর' নামক স্থানে চলে গেলেন এবং ওখানেই তাঁদের বাসস্থান স্থির করে নিলেন। তিনি ওখানে আদওয়াম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন। এ-কারণে তাঁর বংশধরগণ বনি-আদওয়াম নামে প্রসিদ্ধ হলো।

হযরত ইবরাহিম আ. এবং হাক্কুল ইয়াকিনের অন্বেষণ

মধ্যস্থলে হযরত ইসমাইল আ. ও হযরত ইসহাক আ.-এর আলোচনা এসে পড়েছিলো। তাই তাঁদের দুজনের ঘটনাবলি বিস্তারিত বর্ণনা করে দেয়া সঙ্গত মনে হলো। যাতে ঘটনার ধারাবাহিকতায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয়। তা ছাড়া এই ঘটনাগুলোও হযরত ইবরাহিম আ.-এর জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং যথাস্থানেই এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। এখন হযরত ইবরাহিম আ.-এর জীবনের অবশিষ্ট অবস্থার প্রতি মনোযোগ দেয়া যেতে পারে।

বস্তুসমূহের স্বরূপ বা মূল তত্ত্ব অন্বেষণ ও অনুসন্ধানে হযরত ইবরাহিম আ.-এর স্বভাবগত রুচি ছিলো। তিনি প্রতিটি বস্তুর গূঢ় তত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছতে পারার চেষ্টা করাকে তাঁর জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য মনে

---

[৬১] তাওরাত : আবির্ভাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৬৪, আয়াত ১-৬৫।

করতেন। যাতে তিনি বস্তুরাশির তত্ত্বাবলির মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর সত্তা, তাঁর একত্ব এবং তাঁর অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে দিব্য বিশ্বাস লাভের পর বাস্তব বিশ্বাস লাভ করতে পারেন।

পিতা আযার, কওমের জনসাধারণ এবং নমরুদের সঙ্গে বিতর্ক করার সময় তাঁর এই স্বভাবগত রুচির পরিচয় ভালোভাবেই পাওয়া গেছে। এ-কারণে হযরত ইবরাহিম আ. 'মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া' সম্পর্কে আল্লাহপাকের দরবারে প্রার্থনা জানালেন, আপনি কেমন করে মৃতদেরকে জীবন দান করেন, অনুগ্রহ করে আমাকে একটু দেখান।' আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম আ.-কে বললেন, হে ইবরাহিম, তুমি কি এ-বিষয়টির ওপর ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাস রাখো না?' ইবরাহিম আ. তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, 'কেনো বিশ্বাস রাখবো না? আমি দ্বিধাহীনভাবে এর ওপর ঈমান রাখি। কিন্তু আমার এই প্রার্থনা ঈমান ও ইয়াকিনের বিরোধী নয় এই জন্য যে, আমি দৃঢ় জ্ঞানমূলক বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে দিব্য বিশ্বাস এবং বাস্তব বিশ্বাসের (আইনুল ইয়াকিন ও হাক্কুল ইয়াকিনের) প্রার্থী। আমার আকাঙ্ক্ষা এই যে, আমাকে দিব্য চোখে দেখিয়ে দিন মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার আকৃতি ও রূপ কেমন হবে।' আল্লাহ তাআলা তখন বললেন, 'আচ্ছ, যদি তুমি চাক্ষুষ দেখতে তবে কয়েকটি পাখি নিয়ে এসো এবং তাদেরকে খণ্ড খণ্ড করে সামনের পাহাড়ের ওপর রেখে দাও। এরপর দূরে দাঁড়িয়ে তাদেরকে ডাকো।' হযরত ইবরাহিম আ. সেভাবেই কাজ করলেন। তারপর দূরে দাঁড়িয়ে থেকে পাখিগুলোকে ডাক দিলেন। তখন পাখিগুলোর দেহের খণ্ডগুলো পৃথক পৃথকভাবে তৎক্ষণাৎ নিজেদের আকৃতিতে এসে গেলো এবং জীবিত হয়ে হযরত ইবরাহিম আ.-এর কাছে উড়ে চলে এলো। কুরআন মাজিদের সুরা বাকারায় উল্লিখিত ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে—

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (سورة البقرة)

'(স্মরণ করুন) যখন ইবরাহিম বললো, "হে আমার প্রতিপালক, কীভাবে তুমি মৃতকে জীবিত করো আমাকে দেখাও।" তিনি বললেন, "তবে কি তুমি (এই বিষয়ে) বিশ্বাস করো না (ঈমান রাখো না)?" সে বললো,

"কেনো করবো না, তবে এটা কেবল আমার চিত্তের প্রশান্তির জন্য (আমি কেবল আত্মার তৃপ্তি চাই)।" তিনি বললেন, "তবে চারটি পাখি নাও এবং তাদেরকে তোমার বশীভূত করে নাও। তারপর তাদের এক-এক অংশ এক-এক পাহাড়ে রেখে দাও। এরপর তাদেরকে ডাক দাও, তারা দ্রুতগতিতে (দৌড়ে) তোমার কাছে আসবে। জেনে রাখো যে, নিশ্চয় আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"' [সুরা বাকারা : আয়াত ২৬০]

প্রাথমিক যুগের উলামায়ে কেরাম থেকে এই আয়াতের তাফসির এমনই বর্ণিত হয়েছে। হাদিস শরিফের কোনো কোনো রেওয়ায়েতও এই তাফসিরেরই সমর্থন করছে। সুতরাং যারা এ-বিষয়টির অসাধারণত্বের প্রতি লক্ষ করে এই আয়াতগুলো নানা ধরনের ব্যাখ্যা করে অনর্থক উক্তিসমূহ বর্ণনা করেছেন সেগুলো দৃষ্টিপাত করার যোগ্য নয়। আমি ইতোপূর্বে বলেছি যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিচিত্র ও বিস্ময়কর কাহিনি রচনায় দুর্বল রেওয়ায়েতসমূহের ওপর নির্ভর করে ভিত্তিহীন কথায় বিশ্বাস করা যেমন ভুল পথ, তেমনি এটাও বিভ্রান্তিকর পথ যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম সম্পর্কে যেসব মুজিযার কথা কুরআন মাজিদের স্পষ্ট ইবারত সহিহ হাদিসের বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায় সেগুলোকেও শুধু এইজন্য অবিশ্বাস করা হয় বা মনগড়া ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়, যাতে জ্ঞান ও দর্শনের দাবিদার বস্তুবাদীরা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ও জ্ঞানের প্রতি বিদ্রূপ করবে এবং তা নিয়ে উপহাস করবে।

বনি কাতুরা

হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম হযরত সারা রা. ও হযরত হাজেরা রা. ছাড়াও আরো একটি বিয়ে করেছিলেন। সেই স্ত্রীর নাম ছিলো কাতুরা। তাঁর গর্ভ থেকে হযরত ইবরাহিম আ.-এর ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলো।

তাওরাতে বলা হয়েছে—

"আর ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম) আরো এক নারীকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর নাম ছিলো কাতুরা। তাঁর গর্ভ থেকে যামরান, ইয়াকসান, মাদ্দান, মাদয়ান, ইয়াশবাক ও শাওহা জন্মগ্রহণ করেন। ইয়াকসানের ঔরসে দুই পুত্র সাবা ও দুওয়ান জন্মগ্রহণ করেন। আর আসুরি, লাতুসি ও লুওয়াই তাদের সন্তান ছিলো। আর মাদয়ানের সন্তান

ছিলো পাঁচজন : আইফা, গাফার, খায়ুক, আবিদা ও দাআ। এঁদের সবাই ছিলেন বনি কাতুরা বংশের।"[৬২]

মাদয়ানের বংশধরেরা তাদের বসতিকে নিজেদের পূর্বপুরুষ মাদয়ানের নামে মাদায়েন নামকরণ করেছিলো। এরাই আসহাবে মাদয়ান নামে অভিহিত হয়েছে। আর হযরত ইবরাহিম আ.-এর পৌত্র দুওয়ানের বংশধর 'আসহাবুল আইকাহ' নামে বিখ্যাত হয়েছে। এরাই আসহাবে মাদয়ান ও আসহাবুল আইকাহ নামের দুটি সম্প্রদায়। এদের হেদায়েতের জন্য হযরত শুআইব আ.-কে নবীরূপে পাঠানো হয়। এটা হলো কাতাদা রা.-এর রেওয়ায়েত। বর্তমান কালে কোনো কোনো ইতিহাসবেত্তার তাহকিক তার বিপরীত। হাফেয ইবনে কাসির ইসহাবে মাদয়ান ও আসহাবুল আইকাহকে একই সম্প্রদায় হিসেবে মেনে নিয়েছেন। এই তথ্যই প্রণিধানযোগ্য। বিস্তারিত বিবরণ হযরত শুআইব আ.-এর ঘটনায় আসবে।

[৬২] তাওরাত : আবির্ভাব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ২৫, আয়াত ১-৪।

হযরত লুত আলাইহিস সালাম

লুত আ. ও ইবরাহিম আ.

ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে হযরত লুত আ. হযরত ইবারহিম আ.-এর ভ্রাতৃষ্পুত্র ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিলো হারান। হযরত লুত আ. শৈশবে হযরত ইবরাহিম আ.-এর তত্ত্বাবধানের প্রতিপালিত হন। এ-কারণেই তিনি এবং হযরত সারা রা. ইবরাহিমি মিল্লাত বা ধর্মের পূর্বেকার মুসলমান এবং তাঁরা 'সাবেকিন আওয়ালিন' অর্থাৎ প্রথম শ্রেণির অগ্রগামীদের অন্তর্ভুক্ত।

সুরা আনকাবুতে উল্লেখ করা হয়েছে—

فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورة العنكبوت)

'লুত তার (হযরত ইবরাহিম আ.-এর প্রতি অর্থাৎ মিল্লাতে ইবরাহিম-এর) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো। ইবরাহিম বললো, আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে হিজরত[৬৩] (দেশ ত্যাগ) করছি। তিনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' [সুরা আনকাবুত : আয়াত ২৬]

হযরত লুত আ. ও তাঁর স্ত্রী হযরত ইবরাহিম আ.-এর সব হিজরতে সবসময়ই তাঁর সঙ্গে ছিলেন। হযরত ইবরাহিম আ. যখন মিসরে ছিলেন তখনো তাঁরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

তাওরাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিসরে অবস্থানকালে তাঁদের উভয়েরই যথেষ্ট পরিমাণ সামান ও আসবাবপত্র ছিলো এবং গৃহপালিত পশুর বড় বড় পাল ছিলো। এ-কারণে তাঁদের রাখাল ও রক্ষীদের মধ্যে বিশেষ বিবাদ লেগেই থাকতো। হযরত ইবরাহিম আ.-এর রাখালেরা চাইতো, আমার পশুপাল এই চারণভূমি থেকে আগে তাদের খাবার গ্রহণ করুক। আর লুত আ.-এর রাখালেরা চাইতো যে, তাদের দাবি অগ্রগণ্য মনে করা হোক। হযরত ইবরাহিম আ. এই অবস্থা বুঝতে পেরে হযরত লুত আ.-এর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তাঁরা উভয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন

---

[৬৩] হিজরত দুই প্রকারের হয়ে থাকে : ওয়াতানি ও রুহানি। এখানে দু-ধরনের হিজরতই উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলার দীনের হেফাজতের জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়া হিজরতে ওয়াতানি অর্থাৎ বাসস্থানের পরিবর্তন। আর পূর্বপুরুষের পৌত্তলিক ধর্ম পরিত্যাগ করে ইবরাহিমি বা হানিফি ধর্ম অবলম্বন করা হিজরতে রুহানি।

যে, পারস্পরিক সম্পর্ক, সদ্ভাব, ভালোবাসা ও সম্প্রীতির স্থায়িত্ব বহাল রাখার জন্য এটাই সমীচীন হবে যে, হযরত লুত আ. মিসর থেকে হিজরত করে ওরদুনের পূর্বাঞ্চল সাদুম ও আমুরায় চলে যাবেন এবং ওখানে অবস্থান করে হানিফি ধর্মের প্রচার করতে থাকবেন এবং হযরত ইবরাহিম আ.-এর নবীসুলভ সত্যতা প্রচার করতে থাকবেন। এদিকে হযরত ইবরাহিম আ. পুনরায় ফিলিস্তিনে ফিরে যান এবং ওখানে অবস্থান করে ইসলামের শিক্ষা ও প্রচারকে সমুন্নত করতে থাকেন।

সাদুম

ওরদুনের যে-প্রান্তে বর্তমানে মৃতসাগর বা লুত সাগর অবস্থিত, এটাই সেই স্থান যেখানে সাদুম ও আমুরা গোত্র দুটির বসতিগুলো বিদ্যমান ছিলো। এর নিকটবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের বিশ্বাস ছিলো যে, সম্পূর্ণ এই অঞ্চল, যা এখন সমুদ্ররূপে দৃশ্যমান, কোনো এককালে তা শুষ্কভূমি ছিলো এবং তার ওপর শহর বিদ্যমান ছিলো। সাদুম ও আমুরা সম্প্রদায়গুলোর বসতি এই জায়গাতেই ছিলো। প্রথম থেকে এখানে কোনো সমুদ্র ছিলো না; কিন্তু যখন লুত আ.-এর সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহর আযাব এলো, এই ভূখণ্ড চারশো মিটার সমুদ্রের নিচে তলিয়ে গেলো এবং পানি উপরে উথলে উঠলো। তখন এই এলাকা সমুদ্ররূপ ধারণ করে। এইজন্য এর নাম হয়েছে মৃতসাগর বা লুত সাগর। ওই বাসিন্দাদের বিশ্বাস ঠিক হোক আর ভুল হোক, সবসময় এটা মৌলিক সত্য বিষয় যে, এই মৃতসাগরেরই তীরের ওপর সেই ঘটনাটি ঘটেছিলো যা 'লুত সম্প্রদায়ের আযাব' নামে অভিহিত। বিগত দুই বছরের ভূ-তত্ত্বানুসন্ধান মৃতসাগরের তীরে লুত সম্প্রদায়ের বসতিসমূহের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করে এই জ্ঞান ও বিশ্বাসের সামনে আত্মসমর্পণ করেছে।

হযরত লুত আ.-এর সম্প্রদায়

সাদুমে এসে হযরত লুত আ. বসবাস শুরু করলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, সাদুমের অধিবাসীরা অশ্লীল কার্যকলাপ এবং নাফরমানিমূলক কর্মকাণ্ডে ভয়াবহভাবে লিপ্ত। ভাবগতি এমন যে, "সবকিছুর রক্ষক আল্লাহ তাআলার দরবারে তা থেকে নিরাপত্তা কামনা

করছি।" দুনিয়াতে এমন কোনো খারাপ কাছ ছিলো না যা তারা করতো না এবং পৃথিবীতে এমন কোনো ভালো কাজ ছিলো না যা তাদের মধ্যে পাওয়া যেতো। যাবৎ দুনিয়ার অবাধ্য, নাফরমান, হীনস্বভাব ও মন্দ চরিত্রের সম্প্রদায়গুলোর অন্যান্য দোষ ও অশ্লীল কর্মকাণ্ড ছাড়াও লুত আ.-এর সম্প্রদায় একটি কলুষিত কুকর্ম আবিষ্কার করেছিলো। অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের কামরিপু চরিতার্থ করার জন্য স্ত্রীলোকদের পরিবর্তে শ্মশ্রুবিহীন বালকদের সঙ্গে মেলামেশা করতো। দুনিয়ার সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে তখনো পর্যন্ত কোথাও ওই কুকর্মটির প্রচলন ছিলো না। এরাই সেই হতভাগ্য কওম যারা এই অপবিত্র কর্মটির আবিষ্কার করেছিলো। এই কুকর্মটি লেওয়াতাত (সমকামিতা) নামে কুখ্যাত।

আর এর চেয়ে ভয়াবহ ইতরতা, নিকৃষ্টতা ও নির্লজ্জতা এই ছিলো যে, তারা নিজেদের এই অপকর্মকে দোষ মনে করতো না এবং প্রকাশ্যভাবে গর্বের সঙ্গে তা চরিতার্থ করতো।

কুরআন মাজিদে তার বর্ণনা এসেছে—

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ () إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (سورة الأعراف)

'(আর স্মরণ করুন লুতের ঘটনা।) আমি লুতকেও পাঠিয়েছিলাম। সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিলো, "তোমরা এমন (অশ্লীল) কুকর্ম করছো যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করে নি। তোমরা তো কামতৃপ্তির জন্য (কামরিপু চরিতার্থ করার জন্য) নারী ছেড়ে পুরুষের কাছে গমন করো, (সুনিশ্চিত কথা যে,) তোমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। [সূরা আ'রাফ : আয়াত ৮০-৮১]

আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার বলেন, আমি একটি হিব্রু সাহিত্যপুস্তকে তাদের কিছু অপকর্মের অবস্থা পাঠ করেছি। তার সারমর্ম হলো : সাদুমবাসীদের এই অভ্যাস ছিলো যে তারা বহিরাগত ব্যবসায়ী ও বণিকদের পণ্যদ্রব্যকে এক নতুন ও অভিনব পন্থায় লুণ্ঠন করে নিয়ে যেতো। তাদের পদ্ধতি ছিলো এই : বিদেশ থেকে কোনো বণিক সাদুমে এসে যাত্রাবিরতি করলে তার মালামাল দেখার বাহানায় প্রত্যেক ব্যক্তি অল্প অল্প পরিমাণ হাতে উঠিয়ে নিতো এবং উঠিয়ে নিয়েই চলে যেতো। নিরীহ বণিক বেচারা অস্থির ও উদ্বিগ্ন হয়ে বসে থাকতো। সে যদি তার পণ্যদ্রব্য বিনষ্ট হওয়ার অভিযোগ করতো এবং কান্নাকাটি শুরু করতো

হযরত লুত আ. এবং সত্যের দাওয়াত

এসব অবস্থায় হযরত লুত আ. তাদেরকে তাদের এই নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার জন্য তিরস্কার করলেন এবং সম্মান পবিত্রতার জীবনযাপন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করলেন। সুন্দর সম্বোধন ও কথাবার্তা এবং নম্রতার সঙ্গে যত উপায়ে তাদের বোঝানো সম্ভব ছিলো, সব উপায়েই তাদের বোঝালেন। তাদেরকে উপদেশ ও নসিহত প্রদান করলেন। অতীতকালের সম্প্রদায়গুলোর বিভিন্ন অসৎ ও অপকর্মের পরিণাম উল্লেখ করে তাদের সামনে শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত পেশ করলেন। কিন্তু হতভাগ্যদের ওপর কোনো ক্রিয়াই হলো না। বরং তার হিতে বিপরীত হলো এবং তারা বলতে লাগলো—

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

(سورة الأعراف)

'জবাবে তার সম্প্রদায় শুধু বললো, "এদেরকে (হযরত লুত আ. ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং অনুসারীদেরকে) তোমাদের জনপদ থেকে বহিষ্কৃত করো, এরা তো এমন লোক যারা অতি পবিত্র হতে চায়। (নিঃসন্দেহে তারা খুবই পবিত্র লোক।" [সুরা আ'রাফ : আয়াত ৮২]

"এরা নিঃসন্দেহে খুবই পবিত্র লোক" বাক্যটি হযরত লুত আ.-এর পরিবারকে লক্ষ করে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বিদ্রূপাত্মকভাবেই বলেছে। তারা যেনো হযরত লুত আ.-এর খান্দানের উদ্দেশে রহস্য ও উপহাস করতো যে তারা অতি পবিত্রতার দাবিদার। আমাদের বসতিতে এমন লোকদের কী কাজ? অথবা দয়াবান উপদেশ প্রদানকারীর মুরব্বিসুলভ উপদেশে ক্রোধান্বিত হয়ে বলতো, যদি আমরা অপবিত্র ও নির্লজ্জ হই আর তারা পবিত্র হয়ে থাকে, তবে আমাদের বসতির সঙ্গে তাদের কী সম্পর্ক? তাদেরকে এখান থেকে বের করে দাও।

হযরত লুত আ. আর একবার তাদেরকে ভরা জনসমাবেশে নসিহত করে বললেন, তোমাদের এতটুকু অনুভূতিও নেই যে তোমরা বুঝতে পারো পুরুষদের সঙ্গে নির্লজ্জতার সম্পর্ক, রাহাজানি, লুটতরাজ এবং এ-জাতীয় চারিত্রিক অশ্লীল ও অপকর্মগুলো অত্যন্ত খারাপ কাজ। তোমরা জনবহুল মজলিসে এসব কাজ করছো। অপকর্মগুলোর করার পর লজ্জিত হওয়ার

পরিবর্তে তোমরা সেগুলোর আলোচনা শুনিয়ে থাকো। যেনো সেগুলো আদর্শমূলক দেখাবার মতো কাজ, যা তোমরা সম্পন্ন করেছো।
কুরআন মাজিদ তা ব্যক্ত করেছে এভাবে—

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ (سورة العنكبوت)

"তোমরাই তো পুরুষে উপগত হচ্ছো (তাদের সঙ্গে কুকর্ম করছো), তোমরাই তো রাহাজানি করে থাকো এবং তোমরাই তো নিজেদের বৈঠকে (ও পরিবারবর্গের বর্গের সামনে) প্রকাশে ঘৃণ্য কর্ম করে থাকো।" [সুরা আনকাবুত : আয়াত ২৯]
কওমের লোকেরা এই উপদেশ শুনে ক্ষোভে ও ক্রোধে অস্থির হয়ে গেলো। তারা বললো, হে লুত, ব্যস, তুমি এসব নসিহত ও উপদেশ বন্ধ করো। আমাদের এসব কাজে তোমার আল্লাহ যদি অসন্তুষ্ট হয়, তবে সেই আযাব এনে দেখাও, যার উল্লেখ করে বার বার আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছো। বাস্তবিকই যদি তুমি তোমার কথায় সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে তোমার ও আমাদের মধ্যে এখন চরম মীমাংসা হয়ে যাওয়াই আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মর্মে কুরআন মাজিদ বলেছে—

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (سورة العنكبوت)

'জবাবে তার (লুত আ.-এর) সম্প্রদায় শুধু এই বললো, "আমাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"' [সুরা আনকাবুত : আয়াত ২৯]

হযরত ইবরাহিম আ. ও আল্লাহ্ তাআলার ফেরেশতাগণ

এদিকে এ-ধরনের ঘটনা চলছিলো। অপর দিকে হযরত ইবরাহিম আ.-এর সঙ্গে এই ঘটনা ঘটলো যে, ইবরাহিম আ. মাঠে পায়চারি করছিলেন। তিনি দেখলেন তিনজন লোক সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। হযরত ইবরাহিম আ. অত্যন্ত বিনয়ী ও অতিথিপরায়ণ ছিলেন। সবসময় তাঁর দস্তরখান মেহমানদের জন্য প্রশস্ত ছিলো। তাই তিনি সেই তিনজন লোককে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাঁদেরকে তাঁর ঘরে নিয়ে এলেন। একটি গো-বৎস জবাই করে কাবার প্রস্তুত করলেন এবং ভুনা

করে মেহমানদের সামনে পরিবেশন করলেন। কিন্তু তাঁরা খাদ্যগ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করলেন। তা দেখে হযরত ইবরাহিম আ. ভাবলেন, এরা হয়তো কোনো শত্রুপক্ষ হবে। এই ভেবে মনে মনে কিছুটা শঙ্কিতও হলেন যে এরা আবার কে? মেহমানগণ হযরত ইবরাহিম আ.-এর ব্যস্ত তা দেখে মৃদু হেসে তাঁকে বললেন, আপনি ঘাবড়াবেন না। আমরা আল্লাহর ফেরেশতা। লূতের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার জন্য প্রেরিত হয়েছি। এই কাজে আমরা সাদুমে যাচ্ছি।

হযরত ইবরাহিম আ. যখন নিশ্চিতরূপে জানতে পারলেন যে, এঁরা শত্রু নন, বরং আল্লাহ তাআলার ফেরেশতা, তখন তাঁর হৃদয়ে সমবেদনার উচ্ছ্বাস এবং ভালোবাসা ও স্নেহের আধিক্য প্রবল হয়ে উঠলো। তিনি লূত সম্প্রদায়ের পক্ষ নিয়ে ফেরেশতাদের সঙ্গে বিতর্ক শুরু করে দিলেন। তিনি তাঁদের বললেন, তোমরা কীভাবে সেই সম্প্রদায়কে ধ্বংস করতে যাচ্ছো যাদের মধ্যে লূতের মতো আল্লাহর মনোনীত নবী উপস্থিত রয়েছে। সে আমার ভাতিজাও এবং হানিফি ধর্মের অনুসারীও। ফেরেশতারা বললেন, আমরা এর সবকিছুই জানি। কিন্তু আল্লাহ তাআলার চরম মীমাংসা এটাই যে, লূতের কওমকে তাদের অবাধ্যতা, নাফরমানি, অপকর্ম, নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার ওপর হটকারিতার কারণে অবশ্যই ধ্বংস করে দেয়া হবে। অবশ্য লূত আ. এবং তাঁর পরিবারবর্গ সেই আযাব থেকে সুরক্ষিত থাকবেন। তবে লূতের স্ত্রী কওমের সহায়তা এবং তাদের অপকর্ম ও নিকৃষ্ট বিশ্বাসসমূহে শরিক থাকার কারণে লূতের সম্প্রদায়ের সঙ্গে আযাবে পাকড়াও হবে। কুরআন মাজিদে এই ঘটনাটি নিম্নরূপে উল্লেখ করা হয়েছে—

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ () إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ () يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (سورة هود)

'এরপর যখন ইবরাহিমের ভীতি দূরীভূত হলো এবং তার কাছে (পুত্র ইসহাকের জন্ম সম্পর্কে) সুসংবাদ এলো তখন সে লূতের সম্প্রদায়ের

সম্পর্কে আমার সঙ্গে বাদানুবাদ[৬৪] করতে লাগলো। ইবরাহিম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল-হৃদয়, (ধৈর্যশীল, ব্যথার ব্যথী দয়ালু) সতত আল্লাহ অভিমুখী। "হে ইবরাহিম, এ থেকে বিরত হও; (তুমি এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করো না।) তোমার প্রতিপালকের বিধান এসে পড়েছে; তাদের প্রতি তো আসবে শাস্তি, যা অনিবার্য। (তা কোনোক্রমেই দূরীভূত হওয়ার নয়।)"' [সূরা হূদ : আয়াত ৭৪-৭৬]

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ () قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ () لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ () مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (سورة الذاريات)

'ইবরাহিম বললো, "হে (আল্লাহর প্রেরিত) ফেরেশতাগণ, তোমাদের বিশেষ কাজ কী? (কী জন্য তোমরা এসেছো?)" তারা বললো, "আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের (লুত আ.-এর সম্প্রদায়) প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে, তাদের ওপর মাটির শক্ত ঢেলা নিক্ষেপ করার জন্য (প্রস্তর বর্ষণ করার জন্য), যা (প্রস্তরগুলো) তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত (করে দেয়া হয়েছে)।"' [সূরা আয-যারিয়াত : আয়াত ৩১-৩৪]

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ () قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (سورة العنكبوت)

'আর যখন আমার ফেরেশতাগণ সুসংবাদসহ ইবরাহিমের কাছে এলো, তারা বললো, "আমরা এই (সাদুমের) জনপদবাসীকে ধ্বংস করবো, এর অধিবাসীরা তো জালিম (অনাচারী)।" ইবরাহিম বললো, "এই জনপদে তো লুত রয়েছে।" তারা বললো, "ওখানে কারা আছে তা আমরা ভালো জানি, আমরা তো লুতকে ও তার পরিজনবর্গকে রক্ষা করবোই, (তাদেরকে আযাব আক্রান্ত করবে না) তার স্ত্রীকে ব্যতীত; সে তো পিছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (সেও জনপদবাসীদের সঙ্গে থাকবে।)"' [সূরা আনকাবুত : আয়াত ৩১-৩২]

---

[৬৪] এখানে يُجَادِلُنَا অর্থাৎ 'আমার সঙ্গে বাদানুবাদ করতে লাগলো' এই কথাগুলো অর্থ আমার প্রেরিত ফেরেশতাদের সঙ্গে বাদানুবাদ করতে লাগলো।—কাশশাফ, তাফসিরে মুফতি আবদুহ।

মোটকথা, হযরত লুত আ.-এর সত্যপ্রচার, সৎকাজের আদেশ প্রদান এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা তাঁর কওমের ওপর কোনো ক্রিয়াই করলো না। তারা তাদের অসৎ খাসলত এবং কুৎসিত কর্মকাণ্ডের ওপর আগের মতোই বহাল থাকলো। হযরত লুত আ. তাদের মধ্যে এতটুকু লজ্জা ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করলেন যে, তোমরা কি এই কথাটুকু চিন্তা করো না যে, আমি দিন-রাত ইসলাম ও সিরাতুল মুস্ত াকিমের দাওয়াত ও পয়গাম পৌঁছে দিতে তোমাদের সঙ্গে অস্থির ও উদ্বিগ্ন রয়েছি। আমি কি আমার এই প্রচেষ্টার জন্য তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় দাবি করেছি? কোনো পারিশ্রমিক চেয়েছি? কোনো উপহার-উপঢৌকন চেয়েছি? আমার বিবেচনায় তো তোমাদের দীন ও দুনিয়ার সৌভাগ্য ও সফলতা ব্যতীত আর কিছুই চাই না। কিন্তু তোমরা আমার কথার প্রতি কর্ণপাতই করলে না।

এই মর্মে কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে—

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ () إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ () إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ () فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ () وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (سورة الشعراء)

'লুতের সম্প্রদায় রাসুলগণকে অস্বীকার করেছিলো। যখন তাদের ভাই লুত তাদেরকে বললো, "তোমরা কি সাবধান হবে না? (তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করো না?) আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসুল। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। (আমার অনুসরণ করো।) আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না, (পারিশ্রমিক চাই না) আমার পুরস্কার তো জগৎসমূহের প্রতিপালকের কাছেই আছে।"' [সুরা শুআরা : আয়াত ১৬০-১৬৪]

কিন্তু তাদের তমসাচ্ছন্ন অন্তরে এসব কথার বিন্দুমাত্রও ক্রিয়া হলো না। তারা হযরত লুত আ.-কে দেশ থেকে বের করে দেয়ার এবং প্রস্তর নিক্ষেপ করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়ার হুমকি দিতে লাগলো। যখন তাদের বিষয়গুলো চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেলো, তাদের দুর-অদৃষ্ট কোনোভাবেই তাদেরকে সৎ চরিত্রের জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুত হতে দিলো না, তখন তাদের সামনে তা-ই এসে উপস্থিত হলো যা আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত

ও কর্মফলের নীতিমালার নিশ্চিত ব্যবস্থা। অর্থাৎ অপকর্মের ওপর হটকারিতার শাস্তি হলো বিনাশ ও ধ্বংস।

সারকথা, আল্লাহর ফেরেশতারা হযরত ইবরাহিম আ.-এর কাছ থেকে রওয়ানা হয়ে সাদুমে পৌঁছলেন। ওখানে গিয়ে তাঁরা হযরত লুত আ.-এর মেহমান হলেন। তাঁরা আকারে ও গঠনে সুশ্রী ও সুন্দর ছিলেন এবং বয়সে তরুণ-যুবাদের আকৃতিতে ছিলেন। হযরত লুত আ. এই মেহমানদের দেখে ঘাবড়ে গেলেন। তিনি আশঙ্কা করলেন যে, তাঁর দুর্ভাগা কওম এই মেহমানদের সঙ্গে না-জানি কেমন আচরণ করবে? কেননা, আগন্তুকগণ তখনো লুত আ.-কে বলেন নি যে তাঁরা আল্লাহ তাআলার পবিত্র ফেরেশতা।

হযরত লুত আ. তখনো দ্বিধায় আছেন। ইতোমধ্যে কওমের লোকেরা তা জানতে পেরে লুত আ.-এর বাড়ি ঘেরাও করলো এবং দাবি করতে লাগলো যে, তুমি এই মেহমানদের আমাদের হাতে সোপর্দ করে দাও। হযরত লুত আ. তাদেরকে যথাসাধ্য খুব বুঝালেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে কি সুস্থ প্রকৃতির একজন মানুষও নেই যে মানবতার পরিচয় দেবে এবং সত্যকে বুঝবে? তোমরা কেনো এই লা'নতে পতিত হয়েছো এবং কামরিপু চরিতার্থ করার জন্য স্বাভাবিক পদ্ধতি বর্জন করে এবং বৈধ উপায়ে নারীদেরকে জীবনসঙ্গিনী করে নেয়ার পরিবর্তে এই অভিশপ্ত নির্লজ্জতায় নিমজ্জিত রয়েছো? আহা, কী ভালো হতো যদি আমি কোনো দৃঢ় নির্ভরযোগ্য শক্তিশালী হস্তের সাহায্য লাভ করতে পারতাম!

হযরত লুত আ.-এর এই অস্থিরতা রেখে ফেরেশতারা বললেন, আপনি আমাদের বাহ্যিক আকৃতি দেখে ঘাবড়াবেন না। আমরা আযাবের ফেরেশতা। কর্মফল সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার আইনের মীমাংসা এদের ব্যাপারে সুদৃঢ়। এখন আযাব এদের মাথার ওপর থেকে আর টলবে না। আপনি এবং আপনার পরিবারবর্গ আযাব থেকে রক্ষিত থাকবেন। কিন্তু আপনার স্ত্রী এই নির্লজ্জদের সঙ্গে থাকবে। আপনার সঙ্গে থাকবে না।

অবশেষে আল্লাহর আযাবের সময় হয়ে এলো। রাতের প্রথম ভাগেই ফেরেশতাদের ইঙ্গিতে হযরত লুত আ. সপরিবারে অপর দিক থেকে বের হয়ে সাদুম থেকে চলে গেলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে যেতে অস্বীকৃতি জানালো এবং পথিমধ্য থেকেই সাদুমে ফিরে এলো। শেষ রাতে প্রথমে

একটি গর্জন সাদুমবাসীকে বিধ্বস্ত করে দিলো। তারপর গোটা বসতির উপরিভাগকে ঊর্ধ্বে তুলে উল্টিয়ে দেয়া হলো। এরপর ওপর থেকে প্রস্তর বর্ষণ করে তাদের নাম-চিহ্ন পর্যন্ত মুছে দিলো। তাদের পরিণাম তা-ই হলো, যা অতীত কওমসমূহের নাফরমানি ও অবাধ্যতার পরিণাম হয়েছিলো।

এই ঘটনাকে কুরআন মাজিদ বর্ণনা করেছে এভাবে—

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ () قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ () قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ () وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ () فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ () وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ () وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ () قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ () وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ () قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ () قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ () لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ () فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ () فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ () إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (سورة الحجر)

‘এরপর (প্রেরিত) ফেরেশতারা যখন লুত-পরিবারের কাছে এলো, তখন সে (লুত) বললো, “তোমরা তো অপরিচিত লোক। (নবাগত লোক মনে হচ্ছে।)” তারা বললো, “না, ওরা (লুত আ.-এর সম্প্রদায়) যে-বিষয়ে সন্দিহান ছিলো, আমরা তোমার কাছে তা নিয়ে এসেছি; (অর্থাৎ ধ্বংস হওয়ার সংবাদের প্রতি লোকদের বিশ্বাস ছিলো না।) আমরা তোমার কাছে সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং অবশ্যই আমরা (আমাদের বর্ণনার ক্ষেত্রে) সত্যবাদী; সুতরাং তুমি রাতের কোনো এক সময়ে (রাত থাকতে থাকতেই) তোমার পরিজনবর্গসহ বেরিয়ে পড়ো এবং তুমি তাদের পশ্চাদনুসরণ করো (সবার পেছনে থাকুন) এবং (লক্ষ রাখুন) তোমাদের মধ্যে কেউ যেনো পেছন দিকে না তাকায়; তোমাদেরকে যেখানে যেতে বলা হচ্ছে তোমরা সেখানে চলে যাও।” আমি তাকে (লুতকে) এই বিষয়ে ফয়সালা জানিয়ে দিলাম যে, প্রত্যুষে তাদেরকে সমূলে বিনাশ করা হবে। (ইতোমধ্যে অবস্থা এমন হলো যে,) নগরবাসীরা উল্লসিত হয়ে (আনন্দ উল্লাস করতে করতে) উপস্থিত হলো। সে (লুত) বললো,

"তারা (নতুন লোকেরা) আমার অতিথি; সুতরাং তোমরা আমাকে বেইজ্জত করো না। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমাকে হেয় করো না। (তোমরা কেনো আমাকে অপদস্থ করার পেছনে লেগে গেলে?)" তারা বললো, "আমরা কি দুনিয়াসুদ্ধ লোককে আশ্রয় দিতে তোমাকে নিষেধ করি নি? (আমরা কি তোমাকে বারণ করি নি যে, যে-কওমেরই লোক হোক না কেনো, তোমার এখানে এনে মেহমান রেখো না?)" লুত বললো, "একান্তই যদি তোমরা কিছু করতে চাও তবে আমার এই কন্যারা[৬৫] রয়েছে।" (কিন্তু শহরে অধিবাসী নারীদের প্রতি তারা ভ্রুক্ষেপও করতো না।) (আল্লাহর ফেরেশতাগণ লুত আ.-কে বললেন,) "তোমার জীবনের শপথ, তারা তো মত্ততা বিমূঢ় হয়েছে। (তারা আপনার কথায় কর্ণপাত করবে না।)" এরপর সূর্যোদয়ের সময় মহানাদ (ভয়ঙ্কর গর্জন) তাদেরকে আঘাত করলো; আর আমি জনপদকে উল্টিয়ে ওপর-নিচ করে দিলাম এবং তাদের ওপর (পোড়ামাটির) প্রস্তর-কঙ্কর বর্ষণ করলাম। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য। (যারা প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে পরিচয়-জ্ঞানের অধিকারী।)'
[সুরা আল-হিজর : আয়াত ৬১-৭৫]

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ () وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ () قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ () قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ () قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ () فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ () مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (سورة هود)

---

[৬৫] অর্থাৎ লুত আ.-এর সম্প্রদায়ের কন্যারা। নবী নিজ সম্প্রদায়ের পিতৃতুল্য। তাই তিনি তাদেরকে নিজের কন্যা বলেছেন।

‘এবং যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লুতের কাছে এলো, তাদের আগমনে সে বিষণ্ন হলো (তাঁদের আগমনে আনন্দিত হন নি) এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করলো (তাঁদের উপস্থিতি তাঁকে অস্থির করে তুললো) এবং বললো, “এটা এক নিদারুণ দিন! (এটা বড়ই বিপদের দিন!)” তার সম্প্রদায় (অপরিচিত লোকদের আগমনের সংবাদ পেয়ে) তার কাছে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে এলো এবং পূর্ব থেকেই তারা কুকর্মে লিপ্ত ছিলো। সে (লুত আ.) বললো, “হে আমার সম্প্রদায়, এরা আমার কন্যা, (অর্থাৎ বসতির স্ত্রীলোকেরা যাদেরকে তিনি নিজের কন্যার স্থলবর্তী মনে করতেন এবং যাদেরকে লোকেরা ত্যাগ করে রেখেছিলো) তোমাদের জন্য এরা (বৈধ ও) পবিত্র। সুতরাং (তাদের প্রতি লক্ষ করো এবং অন্য বিষয়ে চিন্তা করো না এবং) তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে হেয় করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোনো ভালো মানুষ নেই?” তারা বললো, “তুমি তো জানো, তোমার কন্যাদেরকে আমাদের কোনো প্রয়োজন[৬৬] নেই; আমরা কী চাই তা তো তুমি জানোই।” সে (লুত আ.) বললো, “তোমাদের ওপর যদি আমার শক্তি থাকতো অথবা আমি আশ্রয় নিতে পারতাম কোনো সুদৃঢ় স্তম্ভের! (যদি তোমাদের বাধা প্রদানের শক্তি আমার থাকতো বা অন্যকোনো সাহায্য আমি পেতাম!)” তখন তারা (মেহমানগণ) বললো, “হে লুত, নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রেরিত ফেরেশতা। (সুতরাং তোমার ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই।) তারা কখনোই তোমার কাছে পৌঁছতে পারবে না। (তোমার ওপর শক্তি বিস্তার করতে পারবে না।) সুতরাং তুমি রাতের কোনো এক সময়ে (রাতের এক অংশ কেটে গেলে) তোমার পরিবারবর্গসহ বের হয়ে পড়ো এবং তোমাদের মধ্যে কেউ পেছন দিকে তাকাবে না, (কোনে বিষয়ে যেনো চিন্তা না করে।) তোমার স্ত্রী ব্যতীত। (তোমার স্ত্রী তোমাদের সঙ্গী হবে না, সে পেছনেই থেকে যাবে।) তাদের যা ঘটবে তারও তাই ঘটবে। নিশ্চয় ভোর তাদের জন্য নির্ধারিত কাল। (শাস্তির জন্য নির্ধারিত সময় হলো ভোর।) ভোর কি নিকটবর্তী নয়? (ভোর হওয়ার আর বিশেষ দেরি নেই।)” এরপর যখন আমার (নির্ধারিত বিষয়ের) আদেশ এলো

---

[৬৬] 'حَقٌّ' শব্দটি এখানে ‘প্রয়োজন’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তখন আমি (সেই) জনপদকে উল্টিয়ে দিলাম (এবং জমিনকে সমতল করে দিলাম) এবং তাদের ওপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম প্রস্তর-কঙ্কর, যা তোমার প্রতিপালকের কাছে চিহ্নিত[৬৭] ছিলো। তা জালিমদের (মক্কার দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের) থেকে দূরে নয়। (তারা তাদের ভ্রমণে ও সফরে সেই স্থান দিয়ে অতিক্রম করে থাকে। ইচ্ছা করলে তারা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।' [সুরা হুদ : আয়াত ৭৭-৮৩]

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ () قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ () إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ () إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ (سورة الحجر)

'সে (ইবরাহিম) বললো, হে ফেরেশতাগণ, তোমাদের আর বিশেষ কী কাজ আছে?" তারা বললো, "আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়েছে—তবে লুতের পরিবারের বিরুদ্ধে নয়, আমরা অবশ্যই এদের সবাইকে রক্ষা করবো, কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়; আমরা স্থির করেছি[৬৮] যে, সে অবশ্যই পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।"' [সুরা আল-হিজর : আয়াত ৫৭-৬০]

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ () إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ () ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ () وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ () إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ () وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (سورة الشعراء)

'তখন আমি তাকে এবং তার পরিবার-পরিজন সবাইকে রক্ষা করলাম, এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে ছিলো পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তারপর অপর সবাইকে ধ্বংস করলাম। তাদের ওপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, ভীতি-প্রদর্শিতদের জন্য ওই বৃষ্টি ছিলো কত নিকৃষ্ট! এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়। তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। [সুরা শুআরা : আয়াত ১৭০-১৭৫]

---

[৬৭] পাথরগুলো সাধারণ পাথরের মতো ছিলো না। সেগুলোতে বিশেষ কিছু চিহ্ন ছিলো। ভিন্নমতে, পাথরের আঘাতে যে মৃত্যুবরণ করতে তার নাম তাতে লিপিবদ্ধ ছিলো।

[৬৮] আল্লাহপাকই তা স্থির করেছিলেন। ফেরেশতাগণ শাস্তি প্রদানের দায়িত্বে নিযুক্ত হওয়ায় তা বললেন।

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (سورة التحريم)

'আল্লাহ কাফেরদের জন্য নুহের স্ত্রী ও লুতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, (অবিশ্বাসীদের জন্য তাদেরকে দৃষ্টান্ত বানিয়েছেন,) তারা আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার (বিবাহের) অধীন ছিলো। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো। ফলে নুহ ও লুত তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারলো না এবং তাদেরকে বলা হলো, "তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সঙ্গে জাহান্নামে প্রবেশ করো।"' [সুরা আত-তাহরিম : আয়াত ১০]

কয়েকটি বিষয়

এক.

উপরিউক্ত আয়াতসমূহে হযরত লুত আ.-এর এই বাক্যগুলো রয়েছে—

هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ

"এরা আমার কন্যা, তোমাদের জন্য এরা পবিত্র।"

هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ

"একান্তই যদি তোমরা কিছু করতে চাও তবে আমার এই কন্যারা রয়েছে।"

অর্থাৎ হযরত লুত আ. তাঁর কওমের ভিড় ও চিৎকার এবং মেহমানদেরকে তাদের হাতে সোপর্দ করে দেয়ার দাবিতে অপারগ হয়ে বললেন, 'তোমরা এই মেহমানদের বিরক্ত করো না। যদি নফসের স্বাভাবিক কামনা পূর্ণ করতে চাও, তবে এই আমার কন্যাগণ বিদ্যমান রয়েছে, তারা তোমাদের জন্য পবিত্র।' হযরত লুত আ.-এর এ-কথার অর্থ কী? একজন নিষ্পাপ ও মর্যাদাবান মানুষ, যিনি আবার আল্লাহর নবীও, কেমন করে এটা পছন্দ করতে পারেন যে, তিনি নিজের নিষ্পাপ কন্যাদেরকে নির্লজ্জ ও অপবিত্র চরিত্রের মানুষদের সামনে পেশ করতে পারেন? এই প্রশ্নের উত্তরে গবেষক উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন :

ক. হযরত লুত আ. একজন নবী। প্রত্যেক নবীই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের পিতা হয়ে থাকেন। কওম মুসলমান হয়ে তাঁর অনুসারী হোক কিংবা তাঁকে অবিশ্বাস করে তাঁর থেকে বিমুখ এবং তাঁর অবাধ্যই থাকুক, উভয় অবস্থায় তারা সবাই তাঁর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বাসী অনুসারীরা উম্মতে ইজাবাত এবং অবিশ্বাসকারীরা উম্মতে দাওয়াত নামে অভিহিত হয়ে থাকে। এ-কারণে উম্মতের সব সদস্যবৃন্দ আম্বিয়ায়ে কেরামের সন্তান-সন্ততি হয়ে থাকে। নবী ও রাসুল তাঁদের রুহানি অর্থাৎ আধ্যাত্মিক পিতা।

সুতরাং হযরত নুহ আ.-এর উদ্দেশ্য ছিলো এই, হে হতভাগার দল, তোমাদের ঘরে ঘরে এগুলো আমার কন্যা তোমাদের জীবনসঙ্গিনীরূপে রয়েছে এবং তোমাদের জন্য তারা বৈধ। তবে তোমরা তাদেরকে ছেড়ে এই অভিশপ্ত ও অপবিত্র কাজের ওপর হটকারিতা করছো কেনো? এমন করো না।

নাউযুবিল্লাহ, তাঁর উদ্দেশ্য এমন ছিলো না যে তিনি তাঁর নিজের ঔরসজাত কন্যাদেরকে লোকদের সামনে পরিবেশন করছেন।

খ. তাওরাত এবং অন্যান্য রেওয়ায়েতের মাধ্যমে জানা গেছে যে, মাত্র তিনজন ফেরেশতা হযরত ইবরাহিম আ.-কে ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ প্রদান করার পর লুত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার জন্য এসেছিলেন। সুতরাং এটা অসম্ভব যে, মাত্র তিনজনের উদ্দেশে গোটা বসতির সমস্ত মানুষ, যাদের সংখ্যা ছিলো হাজার হাজার, কামার্ত হয়ে দৌড়ে এসেছিলো।

বরং আসল কথা হলো এই, সেই কওমের দুইজন সরদার ছিলো। তারা দুজনেই লুত আ.-এর মেহমানদেরকে তলব করেছিলো। কওমের অবশিষ্ট লোকেরা তাদের সরদারকে এই অশ্লীল কুকর্মে সাহায্য করার জন্য ওখানে এসে একত্র হয়েছিলো। আর হযরত লুত আ.-এর দুই কন্যা ছিলেন অবিবাহিতা। তাই তিনি ওই দুই সরদারকে বুঝালেন যে, তোমরা তোমাদের এই অপবিত্র ও নিকৃষ্ট দাবি থেকে নিবৃত্ত হও। আমি আমার কন্য দুজনকে তোমাদের সঙ্গে বিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তারা পরিষ্কার ভাষায় এই প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানালো এবং বললো, লুত, তুমি জানো যে নারীদের প্রতি আমাদের কোনো আগ্রহ নেই।

গ. হযরত লুত আ. নিঃসন্দেহে এই বাক্যটি তাঁর নিজের কন্যাদের সম্পর্কেই বলেছিলেন। কিন্তু তা সেই বুযুর্গ ব্যক্তির কথার মতো ছিলো যিনি কোনো লোককে অন্যায়ভাবে প্রহৃত হতে দেখে অত্যাচারী প্রহারকারীকে বললেন, ওকে মেরো না, তার পরিবর্তে আমাকে মারো। অথচ তিনি খুব ভালো করেই জানেন যে, সে কখনো এমন দুঃসাহস করবে না। কেননা, সে তাঁর চেয়ে কনিষ্ঠ কিংবা তাঁর অধীন। অতএব, ওই বুযুর্গের উদ্দেশ্য ছিলো যেমন জালিম প্রহারকারীকে লজ্জা ও শরম দেয়া, তেমনি হযরত লুত আ.-ও তাদেরকে লজ্জা ও শরম দেয়ার জন্য এবং তাদের অপরকর্মের ওপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত করার জন্য ওই বাক্যগুলো বলেছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, এই দুর্ভাগারা এদিকে আগ্রহও প্রকাশ করবে না এবং কাজেও তারা এমনটি করবে না। ইমাম রাযি, ইস্পাহানি, আবুস সাউদ এই ব্যাখ্যাকেই পছন্দ করেছেন। এটিই আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জারের অভিমত। কিন্তু আমার মতে প্রথম ব্যাখ্যাটি অধিক বিশুদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্য। প্রথম ব্যাখ্যার ব্যাপারে আল্লামা আবদুল ওয়াহ্হাবের 'এই মতটি দুর্বল'—এমন কথা বলা ঠিক নয়। তাঁর যুক্তি হলো, এটা কেমন করে সম্ভব হতে পারে যে, হযরত লুত আ. ওইসব কাফের নারীকে নিজের কন্যা বলে স্বীকার করে নেন? আমার কথা হলো, তা এ-কারণে সম্ভব যে, আমি প্রথম জবাবেই বলে এসেছি, নবী নিষ্পাপ। নবী সমস্ত উম্মতের রুহানি পিতা হয়ে থাকেন, যাদের প্রতি তিনি প্রেরিত হয়েছেন। এটা একটি স্বতন্ত্র কথা যে, যেসব উম্মত নবীর প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁর অনুসরণ করে, তাঁরা ওই নবীকে প্রদত্ত সৌভাগ্য ও কল্যাণ থেকে লাভবান হয়। আর যারা অবিশ্বাস করে তারা সেই সৌভাগ্য ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়। তা ছাড়া বর্তমানেও এই প্রথা আছে যে, মুসলিম ও কাফের নির্বিশেষে মুরব্বি শ্রেণির মানুষেরা কমবয়স্কা বালিকাদেরকে 'কন্যা' বা 'বেটি' বলে থাকেন।

দুই.

হযরত লুত আ. যখন দেখলেন তাঁর কওমের লোকেরা তাঁর মেহমানদের সঙ্গে দুশ্চরিত্রমূলক কাজের জন্য গোঁ ধরেছে, লজ্জা-শরম প্রদানে তাদের ওপর কোনো ক্রিয়াই হচ্ছে না এবং লজ্জা, মানবতা, আখলাক ও

মনুষ্যত্বের নামে দোহাই দিয়েও কোনো ফল হচ্ছে না, তখন তিনি অস্থির চিত্তে বলে উঠলেন—

لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ

"তোমাদের ওপর যদি আমার শক্তি থাকতো অথবা আমি আশ্রয় নিতে পারতাম কোনো সুদৃঢ় স্তম্ভের! (কী ভালো হতো! যদি তোমাদের সঙ্গে মোকাবিলা করার শক্তি আমার থাকতো কিংবা কোনো মহাশক্তিমান আশ্রয়কেন্দ্রের আশ্রয় লাভ করতে পারতাম।)"

এখানে 'সুদৃঢ় স্তম্ভ' বা 'শক্তিমান আশ্রয়কেন্দ্র' বলতে তিনি কী উদ্দেশ্য করেছেন? হযরত লুত আ. কি (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তাআলার অসীম ক্ষমতার ওপর নির্ভর করতেন না? যার ফলে তিনি অপর কোনো শক্তিশালী আশ্রয়কেন্দ্রের আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন?

সহিহ বুখারির রেওয়ায়েত সুন্দরভাবে এই জিজ্ঞাসার জবাব দিয়ে দিয়েছে। ওই রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

يَغْفِرُ اللَّهُ لِلُوطٍ إِنْ كَانَ لَيَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ

'আল্লাহ তাআলা লুতকে ক্ষমা করুন। (কেননা, তাঁকে এত বেশি অস্থির ও বিচলিত হতে হয়েছিলো যে,) তিনি সুদৃঢ় স্তম্ভের বা শক্তিশালী আশ্রয়কেন্দ্রের[৬৯] আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন।'[৭০]

হাদিসটির অর্থ হলো, হযরত লুত আ. আল্লাহকে ভুলে অন্যকোনো শক্তির প্রার্থনা করেন নি; বরং তিনি এমন করুণ অবস্থায় ছিলেন, যখন তাঁর মনে এই আকাঙ্ক্ষা হলো যে, কী ভালো হতো যদি আল্লাহ তাআলা এ-সময় আমাকে শক্তি দান করতেন আর আমি এখনই এই হতভাগ্যদেরকে তাদের অশ্লীল কর্মকাণ্ডের মজা দেখিয়ে দিতে পারতাম! ফলে 'মহাশক্তিমান আশ্রয়কেন্দ্র' অর্থাৎ তাঁর প্রতিপালক তাঁকে সাহায্য করলেন। ফেরেশতারা তাঁর কাছে আগমনের রহস্য প্রকাশ করে দিলেন এবং তাঁকে সান্ত্বনা ও প্রশান্তি প্রদান করে বললেন যে, আপনি অস্থির-পেরেশান হবেন না। কিছুক্ষণ পরেই এই হতভাগারা তাদের কৃত কুকর্মের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

---

[৬৯] মূল কিতাব ২৬৯।

[৭০] সহিহ বুখারি : হাদিস ৩৩৭৫।

তিন.

কোনো কোনো মুফাস্‌সির لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً বাক্যে (كُمْ) সর্বনামটির লক্ষ্যস্থল ফেরেশতাদেরকে বুঝেছেনে এবং তাঁর এর এই অর্থ করেন যে, (যেহেতু হযরত লুত আ. তখন অপরিচিত অতিথি তিনজনকে মানুষই মনে করেছিলেন, এ-কারণে) হযরত লুত আ. বললেন, 'কী ভালো হতো যদি তোমরা সংখ্যায় এত অধিক হতো যে ওদের মোকাবিলায় আমি তোমাদের মাধ্যমে শক্তিপ্রাপ্ত হতাম। এজন্যই ফেরেশতারা হযরত আ.-এর এই আকুল বাণী শুনে বললেন—

يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ

"হে লুত, নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রেরিত ফেরেশতা। তারা কখনোই তোমার কাছে পৌছতে পারবে না। [সুরা হুদ : আয়াত ৮১]

তাওরাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত লুত আ. পরিবারবর্গসহ সাদুম থেকে হিজরত করে 'যাওআর' অথবা 'যাগার' নামক বসতির দিকে চলে গিয়েছিলেন। যাগার বসতি সাদুমের কাছাকাছিই ছিলো। সূর্যোদয়ের পর তারা যখন ওখান থেকে সাদুমের দিকে তাকালেন, দেখলেন ওখানে ধ্বংস ও বিনাশের চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নেই। হযরত লুত আ. এরপর যাগার জনপদও ত্যাগ করলেন এবং তারই কাছাকাছি এক পাহাড়ের ওপর গিয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে বসবাস করতে থাকলেন। ওই পাহাড়েই তাঁর ইন্তেকাল হয়।

হযরত ইবরাহিম আ. মুজাদ্দিদে আম্বিয়া

উপরিউক্ত ধারাবাহিক ঘটনাবলি থেকে অনেক উপদেশ ও শিক্ষা অর্জিত হওয়া ছাড়াও সবচেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় প্রকাশ পায়। তা হলো হযরত ইবরাহিম আ.-এর ব্যক্তিত্ব নবুওত ও রিসালাতের পদেও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এমনিতে তো আল্লাহ তাআলার প্রত্যেক নবীই তাওহিদ ও একত্ববাদের আহ্বানকারী ও প্রচারক এবং কুফর ও শিরকের বিরোধিতাকারী ও শত্রু। এ-কারণেই আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম-এর শিক্ষাসমূহের মধ্যে এ-দুটি বিষয় ব্যাপক। বরং রুহানি দাওয়াত এবং পথপ্রদর্শনের মূল ভিত্তি শুধু এই দুটি বিষয়ের

ওপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু হযরত ইবরাহিম আ.-ই কেবল এই বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন যে, এই পৃথিবীতে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যাঁকে তাওহিদ ও একত্ববাদের পথে কঠিন থেকে কঠিন পরীক্ষাসমূহ এবং ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্কর বিপদসমূহের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আর তিনি ওইসব পরীক্ষা ও বিপদাপদের মোকাবিলা করে সফলকাম প্রমাণিত হয়েছেন।

এক.

গভীরভাবে চিন্তা করুন, বার্ধক্য এবং নৈরাশ্যের বয়সে হাজার হাজার দোয়া এবং লাখ লাখ আরজু-আবেদন করার পর আল্লাহ তাআলা এক পুত্র সন্তান দান করলেন। পুত্র তখনো দুগ্ধপোষ্য, সেই সময়েই আল্লাহ তাআলার আদেশ হলো—শিশুপুত্রকে এবং তার মাকে তোমার ঘর থেকে পৃথক করে দাও এবং ধু-ধু প্রান্তরে ও খেত-খামারহীন অনাবাদ পাথুরে ভূমিতে, যেখানে পানি ও তৃণলতার নামচিহ্ন পর্যন্ত, তাদের দুজনকে নিয়ে গিয়ে রেখে আসো। এরপর কী হলো? হযরত ইবরাহিম আ. কি এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করলেন? আল্লাহর আদেশপালনে কোনো ধরনের ওজর পেশ করলেন? না, কখনো না। বরং তৎক্ষণাৎ বিনা দ্বিধায়, বিনা আপত্তিতে তাঁদেরকে মক্কার পাথুরে ভূমিতে নিয়ে গিয়ে রেখে এলেন।

দুই.

এরপর সেই শিশু যখন জ্ঞান-বুদ্ধির বয়সে উপনীত হলো এবং পিতা-মাতার চোখের জ্যোতি ও মনের সুখ লাভের কারণ হলো, তখন আবার ইবরাহিম আ.-এর প্রতি আল্লাহ তাআলার আদেশ হলো, তোমার এই পুত্রকে আমার নামে কুরবানি করে দাও এবং নিজের আত্মত্যাগ ও আনুগত্যের প্রমাণ দাও।

এমন নিদারুণ সময়ে একজন চরম পর্যায়ের অনুগত এবং সর্বোচ্চ স্তরের আজ্ঞাবহ ব্যক্তিরও ঈমান ও ইয়াকিনের নৌকা কেমন ঘূর্ণিপাকে পতিত হয়—তা পাঠক নিজেই অনুমান করুন। এরপর ইবরাহিম আ.-এর প্রতি লক্ষ করুন, আল্লাহ তাআলার যে-ওহি স্বপ্নাকারে তাঁর কাছে এলো, তিনি তার কোনো অপব্যাখ্যা করলেন না, তার জন্য কোনো ছল-চাতুরি বা কৌশলেরও কল্পনা করলেন না। ভোরে উঠেই কলজের টুকরোকে সঙ্গে

নিলেন এবং আল্লাহর আদেশ পালনে তাঁর মানবসুলভ শক্তিতে যা-কিছু করার সাধ্য ছিলো তার সবকিছুই করলেন। এভাবে সাধারণ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিকে হতভম্ব করে দেয়া বিশ্বস্ততা ও আল্লাহভক্তির প্রমাণ দিলেন।

তিন.

তৃতীয় কঠিন পরীক্ষা সে-সময়ে হয়েছিলো যখন তাঁর পিতা, তাঁর সম্প্রদায় ও তৎকালীন রাজা সবাই একমত হয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, ইবরাহিম হয় তা সত্য প্রচার থেকে বিরত হোক, অন্যথায় তাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে ছাই-ভস্ম করে দেয়া হোক। তবে জালিমদের এই সিদ্ধান্ত ও ঐকমত্য কি ইবরাহিম আ.-এর কদমকে টলমল করে দিয়েছিলো? না, বরং তিনি দৃঢ় সংকল্পের পাহাড় হয়ে তাঁর আগের স্থানেই অটল থাকলেন এবং প্রথম থেকেই যে-দৃঢ়তার সঙ্গে সত্যের পয়গাম ও হেদায়েতের বাণী শুনাচ্ছিলেন সেভাবেই শুনাতে থাকলেন। শত্রুরা যা বলেছিলো, শেষ পর্যন্ত তারা তা করেই দেখলো এবং তাঁকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলো। কিন্তু ইবরাহিম আ.-এর শান্তভাবের মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য দেখা গেলো না। অবশ্য ইবরাহিম আ.-এর প্রতিপালক শত্রুদের শত্রুতা এবং তাদের সব ধরনের ষড়যন্ত্রকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন। তাই জ্বলন্ত আগুনের শিখাসমূহ তাঁর জন্য শীতল ও শান্তিময় হয়ে গিয়েছিলো। এভাবে হযরত ইবরাহিম আ. তাঁর মহাশক্তিশালী রক্ষকের ছায়াতলে থেকে আখেরাতে সৌভাগ্য ও কল্যাণ অব্যাহত রেখে সবসময়ের জন্য আল্লাহর বান্দাদেরকে আলোকিত করতে থাকলেন। ফলে তাঁর সৎসাহস এবং আল্লাহর প্রতি আহ্বান আগের চেয়ে আরো তীব্র হয়ে উঠলো।

এসব কঠিন পরীক্ষা এবং সেগুলোতে দৃঢ়তার পরিচয় প্রদান ছাড়াও হযরত ইবরাহিম আ.-এর এই বিশেষত্ব ছিলো যে, তিনি শিরক ও তাওহিদের বিপরীতমুখী জীবনের জন্য এমন একটি পার্থক্য প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন, যা তাঁরই মতো মহান মর্যাদার অধিকারী নবীর শানের উপযোগী ছিলো। অর্থাৎ তিনি প্রতিমাপূজা ও নক্ষত্রপূজার খণ্ডন ও অবমাননায় এবং তাদের নিন্দনীয়তা প্রকাশ করে এ-কথা বলেছিলেন—

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি (কারো দ্বারা সৃষ্ট নন, বরং তিনিই) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন (এবং যাঁর আদেশ অনুযায়ী আসমান-জমিন ও সমস্ত সৃষ্ট বস্তুসমূহ চলছে) এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।" [সুরা আন'আম : আয়াত ৭৯]

হযরত ইবরাহিম আ.-এর এই উক্তির অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলাকে কল্পনা করার দুটি পথ রয়েছে : একটি সঠিক পথ, অপরটি ভুল পথ। ভুল পথটি হলো, আগে থেকেই এমন বিশ্বাস তৈরি করে নেয়া হয় যে, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা এবং খুশি রাখা এবং তাঁর উপাসনা ও আরাধনার জন্য প্রতিমাসমূহ এবং নক্ষত্রমণ্ডলীর পূজা করতে হবে। কারণ এসব আত্মা যখন আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে, তখন তারাই আল্লাহকে আমাদের প্রতি রাজি-খুশি ও সন্তুষ্ট করে দেবে। এই আকিদা ও বিশ্বাসের নামই শিরক ও সাবিয়িত্যাত। কারণ, এসব আকিদা-বিশ্বাস অনুসারে ইবাদত ও উপাসনার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য, যা কেবল একক সত্তার জন্য নির্দিষ্ট থাকা উচিত ছিলো, অন্যদের জন্যও যৌথ ও সাধারণ হয়ে পড়ে এবং এটাই শিরকের স্বরূপ।
এর বিপরীতে সঠিক পথ হলো, এই জ্ঞান ও বিশ্বাসকে আকিদা বানিয়ে নেয়া হয় যে আল্লাহ তাআলার সম্মতি ও সন্তুষ্টি অর্জন করার পন্থা এটা ছাড়া আর কোনোটি নয় যে, কেবল তাঁরই ইবাদত করা হবে, তাঁকেই প্রয়োজন পূরণকারী, রিযিক প্রদানকারী, অভাব মোচনকারী এবং মুশকিল আসানকারী বিশ্বাস করতে হবে। উপকার ও ক্ষতি, সুস্থতা ও ব্যাধি, দরিদ্রতা ও ধনাঢ্যতা, রিযিকের সঙ্কীর্ণতা ও সচ্ছলতা, মৃত্যু ও জীবন— মোটকথা সমস্ত বিষয়ে তাঁকে এবং একমাত্র তাঁকেই মালিক ও স্বাধীন ক্ষমতাবান মেনে নেয়া হবে এবং তাঁর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির পরিচয় লাভের জন্য তাঁর প্রেরিত নবী ও রাসুলগণের হেদায়েত ও নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করতে হবে। অন্য কথায় বলা যায় যে, আল্লাহকে রাজি-খুশি রাখা এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করার জন্য দেবী ও দেবতাদেরকে মাধ্যম বানানোর কোনো প্রয়োজন নেই; বরং শুধু সেই একক সত্তার ইবাদত-বন্দেগিকে জীবনের মূলধন বানিয়ে নেয়া হবে। এই আকিদার নামই ইসলাম বা হানিফি ধর্ম।

সুতরাং প্রথম দিন থেকেই হযরত ইবরাহিম আ. প্রথম পন্থাটিকে শিরক সাবিয়ি ধর্ম এবং দ্বিতীয় পন্থাটিকে ইসলাম ও হানিফি ধর্ম নাম দিয়ে উভয় পন্থার মধ্যে স্বতন্ত্র পার্থক্য প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। আর এই পার্থক্যটুকু এমনভাবে গৃহীত হয়েছে যে, পরবর্তী সব নবী ও রাসুলের শিক্ষা ও দাওয়াতের ভিত্তি ও বুনিয়াদকে এই নামেই অভিহিত করা হয়েছে। এমনকি খাতিমুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শেষ পয়গামের নামও হানিফি ধর্ম এবং তাঁর অনুসারীদের নাম 'মুসলিম' সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন : কুরআন মাজিদ বলছে—

مَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (سورة النساء)

'তার অপেক্ষা দীনে কে উত্তম যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে (মুসলিম হয়) এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহিমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে? (ইবরাহিমরে ধর্মের অনুসরণ করে যিনি হানিফ ছিলেন।) এবং আল্লাহ ইবরাহিমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।' [সূরা নিসা : আয়াত ১২৫]

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا (سورة الحج)

'এটা তোমাদের পিতা ইবরাহিমের মিল্লাত (ধর্মাদর্শ)। তিনি পূর্বেই তোমাদের নামকরণ করেছিলেন মুসলিম এবং এই কিতাবেও (সেই নামই পছন্দ করা হয়েছে)।' [সূরা হজ : আয়াত ৭৮]

এটাই একমাত্র কারণ যে, সুরা ইবরাহিমের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তাতে সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের আবির্ভাব, তাঁদের অবস্থাবলি, বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং পরিণতি ও ফলাফল সমষ্টিগতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে যে, নবীগণের হেদায়েতের দাওয়াত কবুলকারী ও প্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যে পার্থক্য কী? আর ভালো-মন্দ, আনন্দ ও বিরোধিতা, মেনে নেয়া ও অবিশ্বাস করার মধ্যে কি 'গাইরুল্লাহ'র অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের খুশি থাকারও কোনো স্থান আছে না-কি শুধু আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির মধ্যে প্রকৃত ঈমান নিহিত রয়েছে?

অতএব, ইবরাহিম আ.-এর বিশেষত্বের প্রতি সমষ্টিগতভাবে লক্ষ করলে নিঃসন্দেহে এ-কথা বলা সঠিক মনে হয় যে, সব নবী ও রাসুলের পবিত্র জীবনে হযরত ইবরাহিম আ.-এর স্থান 'মুজাদ্দিদে আম্বিয়া' রাসুলের স্থান।

আলোচ্য ঘটনাবলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি উপদেশমূলক দৃষ্টান্ত

এক.

মানুষ যখন জ্ঞান ও বিশ্বাসের আলোকে কোনো আকিদা বা বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করে নেয় এবং তা তার অন্তরে দৃঢ়মূল হয়ে তার আত্মার সঙ্গে মিশে যায় এবং তার বুকের মধ্যে পাথরে খোদাই করার মতো কঠিনভাবে খোদিত হয়ে যায়, তখন তার চিন্তা ও কল্পনা, তার ভাবনা ও বিবেচনা এবং ওই বিশ্বাসে তার নিমজ্জিত থাকা এমন স্তরের শক্তিশালী ও দৃঢ় হয়ে ওঠে যে, বিশ্বের কোনো আকস্মিক ঘটনা, কোনো কঠিন থেকে কঠিন বিপদও তাকে তার স্থান থেকে নড়াতে পারে না। সে ওই বিশ্বাসের জন্য নিশ্চিত মনে আগুনে লাফিয়ে পড়ে, বিনা দ্বিধায় সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নির্ভয়ে শূলিকাষ্ঠে চড়ে প্রাণ বিসর্জন দেয়। এ-ব্যাপারে হযরত ইবরাহিম আ.-এর দৃঢ় সংকল্প ও অবিচলতার দৃষ্টান্ত একটি জীবন্ত ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

দুই.

সত্যকে রক্ষা করার জন্য এমন প্রমাণ পেশ করা উচিত যা শত্রু এবং মিথ্যার পূজকের অন্তরে অন্তঃস্থলে পৌঁছে যায় এবং সে সত্যকে মুখে যদিও স্বীকার না করে, কিন্তু তার অন্তর সত্যকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে যায়। বরং কোনো কোনো সময় মুখও ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য ঘোষণা করা থেকে বিরত থাকতে পারে না। কুরআন মাজিদের নিম্নোক্ত আয়াত এ-মূল তত্ত্বটিই ঘোষণা করছে—

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো হেকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সঙ্গে তর্ক করো উত্তম পন্থায়। [সুরা আন-নাহল : আয়াত ১২৫]

তিন.

নবী ও রাসুলগণের কর্মপন্থা হলো, তাঁরা ঝগড়া ও বিতর্কে তর্কশাস্ত্রের পথ মাড়ান না। তাঁদের দলিল ও প্রমাণসমূহের ভিত্তি অনুভবগ্রাহ্য বস্তু এবং চাক্ষুষ দর্শনের ওপর হয়ে থাকে; অর্থাৎ সহজবোধ্য যুক্তি ও জ্ঞানের ওপর। হযরত ইবরাহিম আ.-এর কওমের জনসাধারণের সঙ্গে মূর্তিপূজা ও নক্ষত্রপূজা সম্পর্কিত বিতর্ক এবং নমরুদের সঙ্গে বিতর্ক তার স্পষ্ট ও উজ্জ্বল প্রমাণ।

চার.

কোনো সত্য বিষয়কে প্রমাণিত করার জন্য দলিলের মধ্যে বিরোধী পক্ষে বাতিল আকিদাকে কাল্পনিকভাবে মেনে নেয়া সেই বাতিল আকিদা ও মিথ্যাকে স্বীকার করে নেয়া নয়; বরং এটিকে 'শত্রু পক্ষকে পরাভূত করার জন্য সাময়িকভাবে বাতিলকে মেনে নেয়া' বা 'মাআরিয' বা 'পরোক্ষ ইঙ্গিত' বলা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রমাণ পেশ বিপক্ষকে নিজেদের ভুল স্বীকার করতে বাধ্য করে ছাড়ে। হযরত ইবরাহিম আ. জনসাধারণের সঙ্গে বিতর্কের ক্ষেত্রে প্রমাণের এ-দিকটিই অবলম্বন করেছিলেন এবং তা মূতিপূজারীদেরকে স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলো যে, মূর্তি কোনো অবস্থাতেই শোনেও না, জবাবও দিতে পারে না।

পাঁচ.

যদি কোনো মুসলমানের পিতা-মাতা উভয়ই মুশরিক হয় এবং কোনোক্রমেই শিরক থেকে বিরত না হয়, তবে তাদের শিরকি জীবনের প্রতি অসন্তুষ্ট ও পৃথক থেকে তাদের সঙ্গে পার্থিব কর্মকাণ্ডে ও আচার-আচরণে এবং আখেরাতের উপদেশ ও নসিহতে সম্মান ও ইজ্জতের সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। কঠোর ও কর্কশ ব্যবহার করা উচিত নয়। আযারের সঙ্গে হযরত ইবারিহম আ.-এর ব্যবহার এবং আবু তালেবের সঙ্গে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কর্মপদ্ধতি এ-বিষয়ে অকাট্য ও সুনিশ্চিত প্রমাণ।

ছয়.

যদি মুমিনের অন্তর বিশুদ্ধ আকিদার ওপর নিশ্চিন্তে মুখ ও অন্তরের ঐক্যের সঙ্গে ঈমান রাখে; কিন্তু চাক্ষুষ দর্শন অনুভব করার জন্য কিংবা

যথার্থ বিশ্বাসের স্তর লাভ করার উদ্দেশ্যে কোনো ঈমান ও বিশ্বাসের মাস্‌আলায়ও প্রশ্ন ও অন্বেষণ পথ অবলম্বন করে এবং অন্তরের তৃপ্তির প্রার্থী হয়, তবে এই জিজ্ঞাসা সন্দেহ ও কুফর নয়; বরং প্রকৃত ঈমান। হযরত ইবরাহিম আ. জবাবের وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي 'বরং আমার অন্তরের প্রশান্তির জন্য' বাক্যটির মাধ্যমে এই গূঢ়তত্ত্ব পরিষ্কার হয়ে যায়।

সাত.

দস্তরখানের সম্প্রসারণ যদি লোক দেখানোর জন্য না হয় এবং স্বভাবগত চাহিদার প্রেক্ষিতে অতিথিসেবায় অন্তরের আনন্দ ও চিত্তের প্রশান্তি লাভ হয়, তবে দানশীল স্বভাবগুলোর মধ্যে এটি খুবই ফযিলতপূর্ণ বলে গণ্য হয় এবং তা 'হৃদয়ের বদান্যতা' বা 'অন্তরের উদারতা' নামে অভিহিত হয়।

এই মহাগুণটি হযরত ইবরাহিম আ.-এর আত্মার মৌলিক গুণে পরিণত হয়েছিলো এবং এটা ছিলো তাঁর স্বভাবগত গুণ। অতিথি আপ্যায়ন, দস্ত রখানের সম্প্রসারণ এবং আগন্তুগ অতিথিদেরকে সম্মান করা—এ-জাতীয় গুণগুলো হযরত ইবরাহিম আ.-এর মধ্যে 'উচ্চস্তরের দৃষ্টান্ত'-এর সীমা পর্যন্ত পৌছেছিলো।

কোনে কোনো কিতাবে হযরত ইবারহিম আ.-এর অতিথিপরায়ণতার বিবরণ প্রসঙ্গে একটি চমৎকার ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। একবার হযরত ইবরাহিম আ. তাঁর চিরন্তন অভ্যাস অনুযায়ী কোনো অতিথির অপেক্ষায় মাঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কেননা, মেহমান ব্যতীত তাঁর দস্ত রখানও বিছনো হতো না এবং তিনি আহারও গ্রহণ করতেন না। এ-সময় একজন অতি দুর্বল বৃদ্ধ লোককে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা গেলো। লোকটির কোমর বাঁকা হয়ে গিয়েছিলো এবং সে লাঠির ওপর ভর করে অনেক কষ্টে পথ চলছিলো। হযরত ইবরাহিম আ. লোকাটির সামনে এগিয়ে গেলেন এবং তাকে আনন্দের সঙ্গে সাহায্য ঘরে নিয়ে এলেন। দস্তরখানা বিছানো হলো, খাদ্যদ্রব্য সাজানো হলো। আহারপর্ব শেষ হলে হযরত ইবরাহিম আ. বললেন, সেই একমাত্র প্রতিপালকের শোকর আদায় করো যিনি আমাদেরকে এসব নেয়ামত দান করেছেন। বৃদ্ধ লোকটি রাগান্বিত হয়ে বললো, তোমার একমাত্র প্রতিপালক কে

তাকে আমি চিনি না। আমি আমার মা'বুদের (মূর্তির) শোকর আদায় করে থাকি। তা আমার গৃহে রক্ষিত আছে। বৃদ্ধের এই জবাব হযরত ইবরাহিম আ.-এর মনে খুব কষ্ট দিলো। তিনি তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধকে ঘর থেকে বের করে দিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই হযরত ইবরাহিম আ.-এর অন্তরে এই অশোভনীয় কাজের জন্য অনুশোচনার উদ্রেক হলো। তিনি ভাবলেন, যে-একমাত্র প্রতিপালকের শোকর আমি এই বৃদ্ধ লোকটির মাধ্যমে আদায় করাতে চেয়েছিলাম, তাঁর শান তো এই যে, তিনি এই বৃদ্ধকে তার দীর্ঘ আয়ুষ্কালব্যাপী অনবরত নানাবিধ নেয়ামত প্রদান করে আসছেন এবং তার মূর্তিপূজা ও কুফরের কারণে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে একবেলার জন্যও তার ওপর রিযিকের দরজা বন্ধ করে দেন নি। তবে আমার কি অধিকার ছিলো যে, সে আমার কথা অমান্য করা এবং আল্লাহর বাণী গ্রহণ না করার কারণে ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে আমার ঘর থেকে বের করে দিলাম।

এই ঘটনা ঐতিহাসিক বিচারে গ্রহণযোগ্য হোক বা না হোক, তা কিন্তু এই সত্যটি ঘোষণা করছে যে, হযরত ইবরাহিম আ.-এর বদান্যতা ও উদারতার ওই উচ্চতা—যা 'প্রকৃত উচ্চ দৃষ্টান্ত' পর্যন্ত পৌঁছেছিলো—ছিলো এক দৃষ্টান্ত এবং তা মানুষের মুখে মুখে প্রবাদ হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছিলো। নিঃসন্দেহে তার এই চিন্তা ছিলো সত্যের পয়গাম এবং ইসলামের দাওয়াতে সর্বোত্তম আদর্শ।

আট.

আল্লাহ তাআলা যেসব মহাপুরুষকে নিজের সত্য প্রচারের জন্য মনোনীত করে থাকেন তাঁদের সামনে আল্লাহর মুহাব্বত ও সততা ব্যতীত অন্যকোনো বস্তু অবশিষ্টই থাকে না। এ-কারণে প্রথম থেকেই তাঁদের মধ্যে এই যোগ্যতা প্রদান করা হয় যে,তাঁরা শৈশবকাল থেকে তাঁদের সমসাময়িকদের মধ্যে উজ্জ্বলরূপে পরিদৃষ্ট হন এবং আল্লাহর রাস্তায় পরীক্ষা ও দুঃখ-দুর্দশাকে সহ্য করে ধৈর্য ও সন্তুষ্টির উত্তম আদর্শ স্থাপন করেন থাকেন। হযরত ইসমাইল আ.-এর ঘটনাটি এই বক্তব্যের প্রমাণের জন্য উপযুক্ত সাক্ষ্য এবং হাজার হাজার উপদেশমূলক দৃষ্টান্ত।

নয়.

হযরত লুত আ. যদিও হযরত ইবরাহিম আ.-এর ভাতিজা ছিলেন এবং তাঁর অনুগামীও ছিলেন, কিন্তু তিনি নবুওত লাভ করেছিলেন এবং তাঁকে আল্লাহ তাআলার দূত বানিয়ে দেয়া হয়েছিলো। তাই সাদুম ও আমুরায় সব ধরনের বিপদ এবং বিদেশে শত্রুদের কবলে নানা প্রকারের কষ্ট ভোগ সত্ত্বেও তিনি ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করেছেন। নিজের সম্মানিত চাচা ও খান্দানের সাহায্য চাওয়ার পরিবর্তে কেবল আল্লাহর ওপরই ভরসা করতেন। তিনি আল্লাহর নির্দেশাবলির সামনে সন্তুষ্টি ও আত্মসমর্পণের প্রমাণ দিয়েছেন। এটা সান্নিধ্যপ্রাপ্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের মাকাম।

হযরত ইবরাহিম আ.-এর ইন্তিকাল

[হযরত ইবারহিম আ. বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হতে বাধ্যর্কে উপনীত হলেন। তখন তিনি তাঁর পুত্রদেরকে আহ্বান করে বললেন, প্রিয় বৎসগণ, দয়াময় আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য ইসলামকে দীনরূপে মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমরা মহান আল্লাহর অনুগত্য স্বীকার পূর্বে মৃত্যুবরণ করো না। সবসময় আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা রাখবে। বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ করবে। বিপদ-আপদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার মানুষকে তাঁর আনুগত্যের প্রতি আকর্ষণ করে থাকেন। ধৈর্যহারা হলে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম হয় না। সুতরাং তোমরা বিপদ ও দুঃখ-দুর্দশার সময় ধৈর্য ধারণ করবে এবং কল্যাণ ও মঙ্গলের সময় আল্লাহর শোকর আদায় করবে।

অনন্তর একবার হযরত আযরাইল আ. হযরত ইবরাহিম আ.-কাছে এলেন। ইবরাহিম আ. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আযরাইল, তুমি কি আমার প্রাণ বের করে নিয়ে যেতে এসেছো? আযরাইল আ. বললেন, হ্যাঁ। ইবরাহিম আ. তখন বললেন, তুমি আমার রবকে জিজ্ঞেস করো, কেউ কি কখনো প্রাণপ্রিয় বন্ধুর প্রাণ হরণ করে? তিনি যে আমার প্রাণ হরণের নির্দেশ দিয়েছেন? তৎক্ষণাৎ আযরাইলের প্রতি প্রত্যাদেশ হলো, তুমি আমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করো, সে কি কখনো এমন কথা শুনেছে যে, বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলে বন্ধু তাতে অসম্মত হয়?

এ-কথা শুনে হযরত ইবরাহিম আ.-এর মধ্যে এক অপূর্ব ভাবের উদয় হলো। তিনি আযরাইলকে বললেন, অতি সত্বর তোমার কর্তব্য পালন করো। আমি আমার রবের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে আযরাইল আ. হযরত ইবরাহিম আ.-এর প্রাণ বের করে নিলেন। তখন ইবরাহিম আ.-এর বয়স হয়েছিলো একশো পঁচিশ বছর। তাঁর লাশ মুবারক জেরুজালেমে (বাইতুল মুকাদ্দাসে) সমাহিত করা হয়।]—সংকলিত

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম

বংশপরিচয়

হযরত ইয়াকুব আ. হযরত ইসহাক আ.-এর পুত্র এবং হযরত ইবরাহিম আ.-এর পৌত্র আর ইবরাহিম আ.-এ ভাই বতুইলের দৌহিত্র। তাঁর মায়ের নাম ছিলো রাফকাহ্ বা রাবকাহ্। তিনি তাঁর মায়ের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিলেন। আর তাঁর সহোদর ভাই ইসু হযরত ইসহাক আ.-এর অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। তাওরাতে বর্ণিত তাঁদের দুই ভাইয়ের পারস্পরিক মনোমালিন্যের ঘটনা ইতোপূর্বে উদ্ধৃত করা হয়েছে। হযরত ইয়াকুব আ. যখন তাঁর মায়ের ইঙ্গিতে 'ফাদ্দান আরামে' চলে গেলেন। ওখানে তাঁরা মামা লাবান তাঁর থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, তিনি দশ বছর ওখানে থেকে বকরি চরাবেন। তাহলে লাবান সেই সময়সীমাকে মোহর সাব্যস্ত করে নিজের কন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে করিয়ে দেবেন। হযরত ইয়াকুব আ. সেই সময়সীমা পূর্ণ করলেন। তখন লাবান তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা লায়িয়ার সঙ্গে হযরত ইয়াকুবের বিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু হযরত ইয়াকুব আ. তাঁর হৃদয়ের আকর্ষণ তাঁরা মামার ছোট কন্যা রাহিলের প্রতি প্রকাশ করলেন। লাবান ওজর পেশ করলেন যে, এখানকার প্রথা অনুসারে বড় কন্যার বিবাহের পূর্বে ছোট কন্যার বিয়ে হতে পারে না। সুতরাং তুমি এই সম্বন্ধই মঞ্জুর করো। আর এখানে আরো দশ বছর অবস্থান করে আমার খেদমত করতে থাকো। তাহলে রাহিলকেও তোমার সঙ্গে বিয়ে দেয়া যাবে। (সেকালে দুই সহোদর বোনকে একসঙ্গে বিবাহের মধ্যে একত্র করা শরিয়তে নিষিদ্ধ ছিলো না।) ইয়াকুব আ. সেই দশ বছর সময়সীমাও মামা খেদমতে কাটালেন এবং রাহিলকেও বিয়ে করলেন। তা ছাড়া লায়িয়ার খাদেমা যুলফা এবং রাহিলের খাদেমা বাহলাও ইয়াকুব আ.-এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেলো। চার স্ত্রীর গর্ভ থেকেই তাঁর সন্তান জন্মগ্রহণ করলো। বিনইয়ামিন ব্যতীত তাঁর অন্যান্য সব সন্তানই মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ইয়াকুব আ. জন্মভূমিতে ফিরে আসার পর বিনইয়ামিন এখানে জন্মগ্রহণ করেন। মামা লাবান ইয়াকবুল আ.-কে বিশ বছর নিজের কাছে রাখার পর অনেক ধন-সম্পদ ও সাজ-সরঞ্জাম এবং গৃহপালিত পশুর পাল প্রদান করে বিদায় করলেন। ইয়াকুব আ. পুনরায় তাঁর পিতা-মাতার দারুল হিজরত ফিলিস্তিনে এসে অবস্থান করতে শুরু করলেন।

হযরত ইয়াকুব আ. ফাদ্দান আরামে চলে যাওয়ার পর তাঁর ভাই ইসু অসন্তুষ্ট হয়ে পিতৃব্য ইসমাইল আ.-এর কাছে মক্কায় এসে অবস্থান করতে থাকেন। অবশেষে ইসমাইল আ.-এর কন্যাকে বিয়ে করে কাছাকাছিই বসবাস করতে শুরু করেন। ইনি ইতিহাসে আদওয়াম নামে প্রসিদ্ধ। এই সময়ের মধ্যে তাঁদের দুই ভাইয়ের মধ্যকার মনোমালিন্যও দূর হয়ে যায় এবং উভয়ের মধ্যে পুনরায় ভালোবাসার সম্পর্ক দৃঢ় হয়ে ওঠে। তাঁরা দুজনেই একে অন্যের কাছে উপহার-উপঢৌকন পাঠানোর ধারা প্রচলিত রাখেন।

এসব ঘটনা তাওরাতের বর্ণিত কাহিনি। কুরআন মাজিদ এসব বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে নীরব। শুধু এতটুকু উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইয়াকুব আ. একজন উচ্চ মর্যাদাশীল নবী, ধৈর্য ও দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী এবং হযরত ইউসুফ আ.-এর পিতা। আর এ-প্রসঙ্গেই নাম উল্লেখ করা ব্যতীত হযরত ইউসুফ আ.-এর অপর ভাইদেরও উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআন মাজিদে ইয়াকুব আ.-এর উল্লেখ

কুরআন মাজিদে দশ জায়গায় হযরত ইয়াকুব আ.-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও সুরা ইউসুফের মধ্যে জায়গায় জায়গায় সর্বনাম ও গুণাবলির হিসেবে এবং অন্য কিছু সুরায় যেমন সুরা মুমিনুনে গুণাবলির বিবেচনায় তাঁর আলোচনা রয়েছে। কিন্তু (সুরা ইউসুফে) নামের সঙ্গে কেবল দুই জায়গাতেই উল্লেখ করা হয়েছে। নিচের ছক থেকে তা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে :

সুরা	সুরার নাম	আয়াত
২	সুরা আল-বাকারা	৩৭, ১৩৩, ১৪০
৪	সুরা নিসা	১৬৩
৬	সুরা আল-আন'আম	৮৫
১২	সুরা ইউসুফ	৬, ৩৮
১৯	সুরা মারইয়াম	৬
২১	সুরা আম্বিয়া	৭২
৩৮	সুরা সোয়াদ	৪৫

ইসরাইল

ইবরানি ভাষায় হযরত ইয়াকুব আ.-এর নাম ইসরাইল (اسرئيل)। اسر (ইসরা) শব্দের অর্থ عبد (বান্দা) এবং ئيل শব্দের অর্থ আল্লাহ। দুটি শব্দের সমন্বয়ে একটি যুক্ত নাম। ইসরাইল শব্দের আরবি অর্থ আবদুল্লাহ, (বাংলায় আল্লাহর বান্দা)। হযরত ইবরাহিম আ.-এর পুত্র ইসহাক আ.-এর বংশধরগণ, যারা হযরত ইয়াকুব আ.-এর বংশোদ্ভূত, তাদের তাঁর ইবরানি নাম অনুসারেই বনি ইসরাইল বলা হয়। আজকের ইহুদি ও নাসারাদের প্রাচীন খান্দার এই বংশের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত।

হযরত ইয়াকুব আ.-এর সন্তান-সন্ততি

হযরত ইয়াকুব আ.-এর বারো পুত্র ছিলো। আগেই বলা হয়েছে যে, বিনইয়ামিন ব্যতীত তাঁর বাকি সব পুত্রই ফাদ্দানে আরামে জন্মগ্রহণ করেন। শুধু বিনইয়ামিন ফিলিস্তিনে (কিনআনে) জন্মগ্রহণ করেন। ইয়াকুব আ.-এর পুত্রগণ তাঁর চার স্ত্রীর গর্ভজাত। নিচে বিবরণ পেশ করা হলো :

১। লায়িয়া বিনতে লাবান থেকে—রাদবিন, শামাউন, লাওয়া, ইয়াহুদ, দাইসাকার ও যালুবুন। (৬ জন)

২। রাহিল বিনতে লাবান থেকে—ইউসুফ ও বিনইয়ামিন। (২ জন)

৩। বালহা, রাহিলের খাদেমা থেকে—দান, নাফতালা। (২ জন)

৪। যুলকা, লায়িয়ার খাদেমা থেকে—যাদ, আশির। (২ জন)

নবুওত

হযরত ইয়াকুব আ. আল্লাহ তাআলার মনোনীত নবী ছিলেন এবং কিনআনের অধিবাসীদের হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি বহু বছর পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার এই খেদমতের দায়িত্ব পালন করেছেন। কুরআন মাজিদে তাঁর আলোচনা বেশির ভাগ হযরত ইউসুফ আ.-এর আলোচনার সঙ্গে করা হয়েছে। সুতরাং তা ওখানেই দেখতে পাওয়া যাবে।